শরৎ সাহিত্যে পতিতা

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

এম, এ; বি, এল; পি, আর, এস্।

অধ্যাপক, টি, এন, জে, কলেজ,

ভাগলপুর।

১ম সংস্করণ

চৈত্র—১৩৪৬

মূল্য—এক টাকা চার আনা

প্রকাশক—
শ্রী গোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্থান—
(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা,
কলিকাতা।

(২) শ্রীমাণিক রায় চৌধুরী
৺ মালবিকা স্মৃতি
ভাগলপুর।

মুদ্রক—
শ্রীমাণিকলাল
দি ইউনাইটেড প্রেস লিমিটেড,
ভাগলপুর।

পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা সরযূবালা রুদ্র

পুণ্যচরিতাসু।

ছোটদি,

তুমি বল্‌তে আমার ছোট্ট চিঠি গুলি তোমার ভাল লাগ্‌ত। তাই সুদীর্ঘ পত্র লিখ্‌তে বলেছিলে। আজ পাঠালুম ১১৮ পৃষ্ঠায় ভরা সুদীর্ঘ লিপিকা।

তোমার দরদ অপরিসীম, তোমার অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম। বিচিত্র এই পৃথিবী, তার চেয়েও বিচিত্র এই মানুষ। কত সূক্ষ্ম ধারা জড়িয়ে গড়ে উঠে মানুষের মন। কিন্তু সকল মনের অন্তঃস্থলে থাকে আর একটী শাশ্বত মন, যেখানে একমাত্র শরৎচন্দ্রের মত দরদী শিল্পীরই প্রবেশের অধিকার। সেই শাশ্বত মনের সন্ধান পেয়েছ তুমি। আত্মীয়, অর্দ্ধ-আত্মীয়, অনাত্মীয় তোমার সান্নিধ্যে এসেছে বহু; স্নেহে, যত্নে, আতিথেয়তায়, সহানুভূতিতে মুগ্ধ করেছ তাদের। তোমার মনের সন্ধান যে পেয়েছে, সে ভাবে তুমি তাকেই সবার চেয়ে বেশী ভালবাসো। আমিও বোধ হয় তাদের মধ্যে একজন।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিয়ো।

৺ মালবিকা স্মৃতি।
ভাগলপুর।
১লা চৈত্র, ১৩৪৬ সাল।

ইতি—
তোমার স্নেহমুগ্ধ
শ্রী মাখন লাল

শরৎ সাহিত্যে পতিতা

সূচী

ভূমিকা

'বনফুল'

'শরৎ সাহিত্যে পতিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। মাখনবাবুর অনুরোধ এড়াইবার সাধ্য আমার নাই—এই ভূমিকা লিখিবার ইহাই একমাত্র কৈফিয়ৎ।

প্রবন্ধের নাম 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা' না হইয়া 'শরৎ সাহিত্যে নারী' হইলেই অধিকতর শোভন হইত বলিয়া মনে করি। কারণ শরৎবাবুর 'পতিতা' গুলিতে 'পতিতা' চরিত্র ততটা পরিস্ফুট হয় নাই, যতটা হইয়াছে নারী-চরিত্র। অধ্যাপক মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে বিভিন্ন চরিত্র গুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নারীগুলিকে বারাঙ্গনা, গৃহত্যাগিনী বিধবা, গৃহত্যাগিনী সধবা, নীরব প্রেমিকা এবং কুমারী—এই পাঁচটী শ্রেণীতে সাজাইয়াছেন এবং প্রত্যেক চরিত্রের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সমস্তটা পড়িয়া একটী কথা মনে হয়—দুই একটি চরিত্র ব্যতীত বাকী চরিত্রগুলি এক রকম, বিভিন্ন নামে একই

চরিত্র নানা কাহিণীতে চিত্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় "আভাস" অংশেও ইহার আভাস দিয়াছেন—"আমাদের ধারণা শরৎচন্দ্রের মনের অচেতন স্তরে একটি শাশ্বত নারী ছিল·········জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় সেই নারীটি বিভিন্নরূপে শরৎ সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে।"

এই শাশ্বত নারীটি অ-পতিতা চরিত্র গুলির মধ্যেও কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন তাহা যদি অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়া দেন তাহা হইলে শরৎ সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে জীবন এবং জীবনের জটিল ঘটনাপরম্পরাই মুখ্য বস্তু। সামাজিক ও নৈতিক আবেষ্টনী একটী বিশেষ যুগের চিহ্ন বহন করিয়া জীবনের পটভূমিকা সৃষ্টি করে মাত্র। এই পটভূমিকা পরিবর্ত্তনশীল; জীবন শাশ্বত। যেখানে শিল্পী পটভূমিকা চিত্রণেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া জীবনের চিত্রটীকে নির্জীব করিয়া ফেলেন সেখানেই শিল্পীর পতন। যেখানে জীবনের চিত্র জীবন্ত, সত্য ও সুন্দর, সেখানেই শিল্পী অমর। বলা বাহুল্য 'সুন্দর' কথাটি সামাজিক বা নৈতিক অর্থে নহে, সাহিত্যিক অর্থেই প্রয়োগ করিতেছি। কোন নারী সামাজিক

অর্থে পতিতা কি অ-পতিতা তাহা সাহিত্যিকের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। জীবন-নাট্য-লীলায় তাঁহার ভূমিকাটি সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া অঙ্কিত হইয়াছেন কি না, সাহিত্য সমাজে তাহাই বিচার্য্য। কৃতী শিল্পী শরৎচন্দ্রের এই সৃষ্টিগুলির বিচারে এই সাহিত্যিক সত্যটি সর্ব্বদা স্মরণ না রাখিলে তাঁহার প্রতি অনেক সময় সুবিচার করা যাইবে না। সংস্কারক শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রসলোকে সংস্কারক শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাহুস্বরূপ। সুনীতি বা দুর্নীতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি আমরা যে কোন নীতিবিদের কাছে পাইতে পারি, কিন্তু জীবনের রহস্যলোকে আমরা প্রবেশ লাভ করিয়া ধন্য হই জীবন-দ্রষ্টা সাহিত্যিকের সহায়তায়।

বিখ্যাত কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র জীবন-দ্রষ্টা হিসাবেই আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছেন। 'পতিতা' আলোচনার অবসরে অধ্যাপক মহাশয় এই প্রবন্ধটিতে শরৎবাবুর সেই জীবনদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।

অধ্যাপক মহাশয় শরৎসাহিত্যের একজন অনুরাগী, অনুসন্ধিৎসু সংস্কারমুক্ত ও সমজ্‌দার পাঠক বলিয়া তাঁহার এই

সমালোচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। তাঁহার ভাষা অতি চমৎকার, সমস্ত চরিত্রগুলির খুঁটি নাটি লইয়া স্বচ্ছ ভাষায় তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে শরৎ সমালোচনা-সাহিত্যের অনেক মূল্যবান উপাদান ও তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থের 'প্রযোজনা' অংশটীতে শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সংবাদ আছে। শরৎ সাহিত্যকে বিশেষ রূপে বুঝিবার পক্ষে এই 'প্রযোজনা' অনেক সাহায্য করিবে। শরৎচন্দ্রের জীবনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'নীহারিকা'-রূপ নিশ্চয়ই কৌতুহলোদ্দীপক।

এই প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক মহাশয়ের অন্তরনিবাসী ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-রসিক এক যোগে কাজ করিয়াছেন।

ভাগলপুর,
২৭—২—৪০

ইতি—
"বনফুল"

প্রযোজনা

শরৎচন্দ্র ও ভাগলপুর।

১৯৩১ সালে ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক সঙ্ঘের অধিবেশনে আমি "বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাগলপুরের দান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের ভার গ্রহণ করি। সেই সময় সংবাদ সংগ্রহের অবসরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটী কৌতুহল উদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাই। ৺ গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জীবিত ছিলেন। অতি সদাশয় ব্যক্তি; সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল; সাহিত্য শিষ্য, 'সাহিত্য-সভার সভ্য' এবং তাঁহার 'ছায়া' পত্রিকার লিপিকার। গিরীন্দ্রবাবুর নিকট দুই দিন ব্যাপী ভাগলপুরের বহু সাহিত্য প্রচেষ্টার কাহিনী শুনিলাম।

শরৎবাবুর জীবনের বহু ঘটনা তিনি বলিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার কিছুকাল পরে ভাগলপুর আসিলে তাঁহার নিকট সংবাদ সংগ্রাহক রূপে উপস্থিত হই। তাঁহার বর্ণিত শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে গিরীন্দ্র-বাবুর বর্ণিত ঘটনার বহু পার্থক্য লক্ষ্য করি। অনুসন্ধিৎসাব বশে শরৎবাবুর সমসাময়িক বহু ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হই। যথাঃ— ডাঃ শরৎচন্দ্র মজুমদার ('ইন্দ্রনাথের' তথা রাজেন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), হরেন্দ্রলাল রায় ('ইন্দ্রনাথেব' ভগ্নীপতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভাগলপুর শাখার সভাপতি), রামচন্দ্র রায় (তাঁহার ক্রিকেট খেলার সঙ্গী), চারুচন্দ্র সেন (দাবা খেলার সাথী), চন্দ্রশেখর ঘোষ (ছেনু বাবু—তাঁহার দুষ্টামির শিষ্য), নকুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্রের পিতার বন্ধু) বিপ্রদাস গাঙ্গুলী (শরৎচন্দ্রের আপন মাতুল)। গাঙ্গুলী পরিবারের সোমেন, অরুণ, অমল, অজয় আমাদের ছাত্র। তাহাদের নিকট বহু পারিবারিক খবর পাইয়াছি। শরৎবাবু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আসিলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। শরৎবাবুর মৃত্যু কয়েক দিন পরেই সুরেন্দ্র বাবু ভাগলপুরে আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমার ছাত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন ঘোষ ও আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার নিকট পুনরায় শরৎ

পরিচয় গ্রহণ করি। এবার আরও অনেক নতুন কথা শুনি।

ইদানীং শরৎচন্দ্রের জীবন নানাদিক দিয়া আলোচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। নানা প্রকার সংবাদ "ভারতবর্ষ" "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, শরৎবাবুর চরিত্রের একটা দিক আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। শরৎচন্দ্রকে নতুন রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস চলিতেছে। যদি এই ভাবে আরও কিছুকাল চলে, তবে হয় ত সত্যিকার মানুষ শরৎচন্দ্র অস্তমিত হইয়া যাইবে। আমরা কল্পিত শরৎচন্দ্র দেখিব। ভাগলপুর শরৎচন্দ্রের উন্মেষ-স্থান, ভাগলপুরেই তাঁহার কৈশোর ও যৌবন অতি-বাহিত হইয়াছে। শিক্ষা ও কলেজ জীবন কল্পনার আবেশে ও আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল ভাগলপুরে। সুতরাং আমরা ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের জীবনের বিষয় কিছু তথ্য নির্দ্দেশ করিলাম। হয়ত শরৎসাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ হইবে।

তখনও বাঙ্গলা সাহিত্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, এবং উহার গতি-নির্দ্দেশ হয় নাই; সেই সময়ে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বিবাহিত যুবক হাজীপুর সহর

হইতে শিক্ষকপদ ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে আসিয়া শ্বশুরালয়ে কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, একমাত্র আলস্যকে কেমন করিয়া নিবিড়তর ভাবে উপভোগ করা যায়, তাহাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রাতঃকালে অক্ষক্রীড়া, দ্বিপ্রহরে নিদ্রা, সন্ধ্যায় তাম্রকূট ইত্যাদি সেবন করিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। কিন্তু রাত্রিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কখনো গল্প, কখনো কবিতা, কখনো নাটক, কখনো অসংলগ্ন ঘটনাবলি অক্ষরের সাহায্যে ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতেন। ক্রমশঃ লিপিগুলি সংযোজনা করিয়া দেখিলেন দুইখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস রচিত হইয়াছে। নিজের আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কতিপয় বন্ধুজনকে পড়িয়া শুনাইলেন। বিস্ময়মুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহাকে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিলেন। আনন্দাতিশয্যে আরও কয়েক জন বন্ধুকে সেই আনন্দ পরিবেশন করিলেন। বন্ধুজন পুলকিত ; তারপর সব শেষ। তাঁহার অদ্ভুত খেয়াল ! তাঁহার একটী পুরাতন কাষ্ঠ সিন্দুকে সেই দুইখানি উপন্যাস বন্ধ করিয়া রাখিলেন—যেমন কৃপণ তাহার আজন্মলব্ধ সম্পদকে রক্ষা করে ! তিনি আর সেই দুইখানি উপন্যাসকে লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর করান নাই;

তার সমস্ত শ্রম যেন চরিতার্থ হইয়াছে; তারপর লেখনী স্তব্ধ। তিনিই কথা সাহিত্য-শিল্পী শরৎচন্দ্রের পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরও সেই দুইখানি উপন্যাস দেখা গিয়াছে; শরৎচন্দ্র সেই লেখাগুলি পাঠ করিয়াছেন কিন্তু যত্ন করিবার অভাবে পুস্তক দুই খানির চিহ্ন অবশিষ্ট নাই। পুস্তিকাগুলির সন্ধান পাইলে শরৎ সাহিত্যের ভাবধারার একটী দিক উন্মেষিত হইত।

সেই দিনেও ভাগলপুরে কেদারবাবুর গৃহে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা গৃহীত হইত। তাহাতে বাঙ্গালীর নবীন চিন্তাধারার সঙ্গে ভাগলপুরের একটা যোগসূত্র রক্ষিত ছিল।

গাঙ্গুলী পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালীটোলার একটী প্রাচীন গৃহকোণে যে সাহিত্য বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা লোকচক্ষুর অগোচরে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত পুষ্পিত ও ফলিত হইতে-ছিল। অদ্ভূত প্রকৃতি পিতারই অনুকরণে তদধিক খেয়ালী পুত্র শরৎচন্দ্র তাঁহার জন্মভূমি দেবানন্দপুর ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে মাতুলালয়ে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাস করিতে আসিলেন। লেখাপড়ার জন্য তাঁহাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করান হইল, কিন্তু লেখাপড়া অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গীতে অধিক অনুরাগ। হিন্দুর ধারণানুসারে

রূপ কল্পনায় বাণী "বীণাপুস্তকহস্তা"। তাই বোধ হয় বালক শরৎচন্দ্র পুস্তকবাদ দিয়া বীণার সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। পুস্তকাবৃত্তির পরিবর্ত্তে বীণার সুর ঝঙ্কারে শরতের বাণী বন্দনা রিণিত হইত। শিশুকালে নিজ গ্রামে জনৈক সর্পদক্ষ আত্মীয় শরৎচন্দ্রের ভিতর সর্পপ্রীতি সঞ্চার করিয়াছিল। ভাগলপুরে "সংসারকোষ" গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে শরৎচন্দ্র সর্পের প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। ভাগলপুর তখন নানা প্রকার বিষধর সর্পের জন্য কুখ্যাত ছিল। ভাগলপুরে এই সর্পপ্রীতির জন্য অনেক বন জঙ্গল নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বাহিরে প্রাণনাশের আশঙ্কা এবং গৃহে অসম্ভব নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও শরতের সর্পচর্চ্চার স্পৃহা দুর্দ্দমনীয় ছিল। মৎস্য শিকারে তাঁহার বিপুল আনন্দ। ভাগলপুরের গঙ্গা তাঁহাকে মৎস্য শিকারের বিরাট সুযোগ দিল, বৃষ্টি বাদল ঝড় জলে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার কাব্যের ভিতর ভাগলপুরের সর্প চর্চ্চা ও মৎস্য শিকারের বহু কাহিনী জড়াইয়া আছে।

ইহার কিছুকাল পরের কথা শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, "বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ্। সন্ধ্যা হয় হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ········পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট্ পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল,········পাঁচ সাত

জন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পলাইবার এতটুকু পথ নাই। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটী বাহির হইতে বিদ্যুৎ গতিতে ব্যূহ ভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।" সেই অপরিচিত মানুষটী স্বর্গীয় সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা রাজেন্দ্র অথবা "রাজু"। রাজু শরৎচন্দ্রকে তথা শ্রীকান্তকে সিদ্ধি চিবাইতে দিল, সিগারেট টানিতে বলিল। শরৎচন্দ্র ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। শরৎ 'তিন পা পিছাইয়া গেল'। কিন্তু রাজু স্বচ্ছন্দে সিগারেট টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া শরৎচন্দ্রের মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর এক দিকে চলিয়া গেল। অথচ ভাগলপুরেই সেই যে সিদ্ধি-চিবানো, সিগারেট-টানা ছেলেটী কি যে এক মোহন মন্ত্রে বালক শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করিল, তাহা তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। ইহার বহুকাল পরে যখন শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনের অসংলগ্ন ঘটনাবলী জড়াইয়া শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী তথা ছদ্ম আত্মচরিত রচনা করিতেছিলেন, তখন লিখিলেন, "শুধু এইটী স্মরণ করিতে পারিতেছি না—অদ্ভূত ছেলেটীকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়া-

ছিলাম।" প্রথম পরিচয়ের দিনে রাজুর প্রতি ঘৃণা লইয়া শরৎ বাড়ী ফিরিল। বালক সিদ্ধি খায়, সিগারেট টানে, তাহা শরতের শিশু মনের সংস্কারে আঘাত করিল। শরৎ পূর্ণ মনে রাজুর কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিল না। আবার কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'হঠাৎ কি অনুপম বাঁশীর সুর কানে আসিল'— সেই বাঁশীর সুরে আবার রাজু তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। রাজুর ছন্নছাড়া জীবন শরৎকে চুম্বক টানে টানিতেছিল। ক্রমশঃ পরিচয়ের ভিতর দিয়া শরৎ ও রাজু অতীব অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। সিগারেট ধরিল, সিদ্ধির পূজা করিল, নাট্যশালায় যোগ দিল। শরৎচন্দ্র শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। দুষ্টামি বুদ্ধিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। একদা 'বারারী' রাস্তায় একটী নীলের সাহেবের সঙ্গে রাজু প্রভৃতির বিবাদ হয়; তাহারা সাহেবকে সাইকেল হইতে নামাইয়া উত্তম মধ্যম প্রহার দিতে আরম্ভ করিল। শরৎচন্দ্র তাহার টুপাটী খুলিয়া লইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে টুপীর ভিতর মূত্র ত্যাগ করিলেন এবং সাহেব যাওয়ার সময় তাহার মাথায় পরাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র লেখাপড়ার জন্য মাতুলগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, অথচ রাজুর সংস্পর্শে শরৎ লেখাপড়া হইতে বহুদূরে সরিয়া গেলেন। কোন কোন শুভ অথবা অশুভ মুহূর্ত্তে সংস্কার অথবা বিবেক শরৎকে

বলিত, "তোমার ত এ সাজে নাই বাপু। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়ীতে আসিয়াছিলে তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন"? এ প্রশ্নের উত্তর শরৎচন্দ্র দিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌভাগ্য এই যে ভাগলপুরের 'রাজু' ই শরৎকে সেই ছন্নছাড়া জীবনের অদ্ভূত মোহময় দিব্যদৃষ্টি দান করিতে পারিয়াছিল, তাহা না হইলে ত শরৎচন্দ্র আর পাঁচ জনের মত ভাল মানুষ হইয়া বিবাহ করিয়া সৃষ্টির সহায়তা করিয়া জীবনযাপন করিত। 'শ্রীকান্ত' বাঙ্গলা সাহিত্যের কান্তি বৃদ্ধি করিত না।

শরতের মতন রাজুরও মৎস্য শিকারে বিপুল আনন্দ। একদা গভীর নিশীথে অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে শরৎ মৎস্য শিকারে চলিয়া গেল গঙ্গাবক্ষে। "বায়ুলেশহীন, নিস্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ, নিশীথিনীর সে যে এক বিরাট কালীমূর্ত্তি। নিবিড় কালো চুলে ভূলোক দ্যুলোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।" রাত্রি গভীরা, জাহ্নবীর উর্ম্মিমালা মেঘের অভিসারে নাচিতেছিল। বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া অন্ধকারকে আরও প্রত্যক্ষীভূত করিতেছিল। 'প্রকৃতির সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহার নহে'। তথাপি প্রকৃতির

অবাধ লীলা তাহাকে বিস্মিত করিল, অভিভূত করিল, মুগ্ধ করিল। গঙ্গাতীরের সেই শশ্মান, গঙ্গাবক্ষে সেই মৃত শিশুর শব দেহ তাঁহার কিশোর মনে চাঞ্চল্য রচনা করিল। "আজন্মপুষ্ট সংস্কার তাঁহাকে মৃত্যু ভয় ভীত করিল,, অথচ অভিযানের আনন্দ, রাজুর নির্ভীক সঙ্গ, বালকের জীবনে এক নবীন রাজ্য সৃষ্টি করিল।" সেই মৎস্যাভিযানের ভিতর দিয়া ভাগলপুরের গঙ্গাবক্ষে শরতের প্রাণে প্রাণধর্ম্মের সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব রচিত হইল। সেই দ্বন্দ্বই ত শরৎ সাহিত্যের মূল বস্তু।

গিরীন্দ্রবাবুর নিকট শুনিয়াছি শরৎচন্দ্রের পিতৃগৃহ দেবানন্দপুরে তাঁহার দূরসম্পর্কিয়া এক আত্মীয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামী সর্পপ্রীতি ও সর্পচর্চ্চায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাদের গার্হস্থ জীবনের পশ্চাতে একটী করুণ ইতিহাস ছিল। এক দিন নেশার খেয়ালে তাঁহার প্রিয় সর্পকে চুমকুড়ি দিতে গিয়া তিনি নিজের দুর্দ্দান্ত জীবনের অবসান করেন। তাঁহার সেই ভগ্নী সমস্ত আত্মীয় স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও ধর্ম্মত্যাগী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। "স্বামী নিত্য, স্বামী সত্য; জীবনেও সত্য, মৃত্যুতেও সত্য"- এই সংস্কার সেই দুর্ভাগিনী মহিলার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই স্নেহময়ী সংস্কারবর্দ্ধিতা ভগ্নীর স্নেহ

শৈশবে শরৎচন্দ্রের উপর অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেবানন্দপুরে সংস্কারপালিতা আত্মীয়া ছিলেন শরৎচন্দ্রের শিশুমনের আদর্শ। ভাগলপুরে আসিয়া শরতের নতুন আদর্শ হইল সংস্কারবিবর্জ্জিত চঞ্চল রাজু। ভাগলপুরে তাঁহার প্রাণের মধ্যে তুইটী বিরুদ্ধ শক্তির খেলা চলিতে লাগিল। একদিকে রাজুর তুর্নিবার তুর্দ্দম বাধাহীন ভ্রূক্ষেপ-বিহীন বিভ্রান্ত প্রাণের চিরচঞ্চল গতি, অন্য দিকে তাঁহার চিরসহিষ্ণু ভগ্নীর প্রশান্ত ক্লান্ত মনের বহুযুগ সঞ্চিত সংস্কার। শরৎ-সাহিত্যে এই তুইটী শক্তিই অমর হইয়া আছে। একদিকে পুঞ্জীভূত সংস্কারের প্রতীক্ আত্মীয়া, অন্য দিকে সহজ স্বাধীন প্রাণধর্ম্মের প্রতীক্ রাজু। ভক্ত যেমন তাহার প্রিয় আরাধ্য দেবতাকে মনের গোপন কোনে অতিযত্নে স্মরণ করে, শ্রদ্ধা করে, শরৎও তেমনি করিয়া তাঁহার রাজুদাকে, দেবানন্দপুরের ভগ্নীকে স্মরণ করেন। ছদ্ম জীবন কাহিনীতে রাজুদাকে 'ইন্দ্রনাথ' রূপে এবং ভগ্নীকে 'অন্নদা দিদি' রূপে অমর করিয়া গিয়াছেন।

ভাগলপুরের রাজুই শরৎচন্দ্রকে সত্যিকার শরৎ করিয়া দিয়াছে; শরতের প্রাণের সুপ্ত তুরন্তকে রাজু জাগ্রত করিয়া দিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভে শরৎ নতুন করিয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎ প্রতি মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া যাইতে চায়। মাতুল গৃহের বন্ধন ও আবেষ্টনী আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মানিক্‌সরকার রোডে বাঙ্গালীটোলার চালাঘরের "বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া শরৎচন্দ্র ভরা বর্ষার স্তব্ধ সন্ধ্যায় দিকচক্রবালরেখান্তে কাহার সুনীল নয়ন খুঁজিয়া বেড়াইত"? অন্নদাদি দির! অন্নদা দিদির স্মৃতি মাতুলগৃহের অনাদৃত ভাগিনেয়র প্রাণে তাঁহার চির-সুন্দর শান্ত মঙ্গল হস্ত বুলাইয়া দিত। আবার রুদ্র বৈশাখের খরতপ্ত দ্বিপ্রহরে মজুমদার বাড়ীর অশ্বত্থ বৃক্ষের ঘন পল্লব ছায়ায় ইন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তাম্রকূটের ধূমজালের মধ্যে রাত্রির অভিযানের ক্রম নির্দ্দেশ করিত। এমনি করিয়া কাটিল তাঁহার কিশোর যৌবনের আবেশময় মিলন মুহূর্ত্তগুলি।

নিজকে পরিপূর্ণভাবে নিজের কাছে পাইবার জন্য শরৎচন্দ্র লোকালয় হইতে একটু দূরে সরিয়া রহিলেন। তাঁহার সযত্নরক্ষিত তাম্রকূট কলিকা, সিদ্ধির পাত্র ও কয়েক খণ্ড কাগজ এবং দোয়াত কলম হইল তাঁহার নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তের সাথী। এবার অক্ষরের সাহায্যে নিভৃতে, নিজের মনে, প্রাণ দিয়া, দরদ দিয়া ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন

তাঁহার অবসর মুহুর্ত্তের চিন্তাগুলি, যেমন করিয়া একদা তাঁহার অসংসারী পিতা করিয়াছিলেন। রাজুর অসীম তীব্রতা আর দেবানন্দপুরের দিদির ঐশ্বর্য্যময়ী প্রশান্তি শরৎকে অভিভূত করিয়া দিল। একদিন শরৎ তাঁহার বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিলেন তাঁহার রচনা—সে আজ প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। স্কুলের সীমা ছাড়িয়া তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ঈশানবাবু তাঁহার 'বাসা', 'অভিমান' পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলেন। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইলেন। বন্ধুজনের নিকট মন্তব্য করিলেন যে একজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। ঈর্ষান্ধ লোক মনকে প্রবোধ দিল,—ইহা অধ্যাপকের দুর্ব্বলতা ছাত্রের প্রতি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাগলপুরে বাঙ্গালী সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—রক্ষণশীল ও উদারপন্থী। রক্ষণশীল-দলের সমাজপতি ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ ৺ কেদার গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহাদের পরিবার ছিল শাস্ত্রপ্রাণ। সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল তাঁহাদের নিকট নিষিদ্ধ (Taboo)। উদারপন্থী দলের নেতা ছিলেন রাজা ৺ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দুর্গাচরণ বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন। শিবচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল ব্যাপক, তাঁহার অর্থানুকুল্যে

ভাগলপুরে চলিতেছিল নাটক সঙ্গীত ব্যায়ামচর্চ্চা ইত্যাদি। নবীন দল ছিল তাঁহার ভক্ত। শিবচন্দ্র কখনও সমাজকে পদ দলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইউরোপে ভ্রমণ জনিত পাপস্খালনের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত আয়োজন করেন। কিন্তু ৺ কেদার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ পণ্ড হয় এবং সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এই উপলক্ষ্যে এই দুই পরিবারের মধ্যে ভীষণ বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। শরৎচন্দ্র ছিলেন ৺ কেদার গঙ্গোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত শিবচন্দ্রের গৃহে। শরৎচন্দ্রের গুরুদেব "রাজু" ও তাহার ভ্রাতা শরৎ মজুমদার ছিলেন রাজা শিবচন্দ্রের নাট্যশালা, ব্যায়ামাগার ও সঙ্গীত আসরের অন্যতম উদ্যোক্তা। রাজুর সাহচর্য্যে সঙ্গীতবিলাসী শরৎচন্দ্র উদারপন্থিদের সংস্পর্শ লাভ করিল। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্র গোপনে এই সব 'দুস্কার্য্যে' যোগদান করিতেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'কুকীর্ত্তি' মাতমহের গোচর হইল। নিষ্ঠুর শাসন সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র রাজা শিবচন্দ্রের নাট্যশালায় "জনা" ও "মৃণালিণী" নাটকে যোগ দান করেন। তাঁহার "জনা" অভিনয় কাহিনী আজিও বৃদ্ধদের প্রাণে রস সঞ্চার করে। কিছুকাল পরে

শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তি পণ্ডিতের স্ত্রী দেহত্যাগ করিলে নুতন দলের যুবকগণ তাহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যায়। শরৎচন্দ্রও এই শ্মশান যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। তাহাতে কেদার গঙ্গোপাধ্যায়ের দল আতঙ্কিত হইয়া উঠিল—ধর্ম্ম গেল। শরৎচন্দ্রও সেই সঙ্গে অপাংক্তেয় হইলেন। প্রদীপের নীচেই সব চেয়ে বেশী অন্ধকার। এই ঘটনার পরেই গাঙ্গুলী গৃহে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। নিমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র পরিবেশন করিতে আসিলে রক্ষণশীল দল চিৎকার করিয়া উঠিল—শরৎচন্দ্রকে বৃহিষ্কৃত করিয়া দেও, নচেৎ আমরা নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিব। শরৎচন্দ্র শিবচন্দ্রপন্থী। অতঃ-পর শরৎচন্দ্র মাতুলালয়ে বর্জ্জিত হইল। তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য অনেক দিন হইতে মাতুলগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট ছিল। এবার সুবর্ণ সুযোগ। শরৎচন্দ্র গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। এই সুযোগে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীবেশে ভাগলপুরের বাহিরে কিছুকাল ঘুরিয়া আসেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে অল্প কয়েকজন বন্ধু সহযোগে গোপনে ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র "সাহিত্য সভা" * স্থাপন

* তাঁহার পুরাতন বন্ধু কেহ কেহ বলেন এই 'সাহিত্য সভার' নাম ছিল 'সাহিত্য সংহার'। পরে আবার ভাগলপুরে 'সাহিত্য সংহারের' পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

করিয়াছিলেন। এই সাহিত্য সভার ক্ষুদ্র আয়োজনের অন্তরালে যে বাঙ্গলা সাহিত্যের কত তথ্য ও রত্ন নিহিত আছে, ইহার ছায়ায় যে কত সাহিত্যসেবী বাণীর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে একখানি পুষ্ঠ কলেবর গ্রন্থ হয়। এই সভার যাহারা নিয়মিত সভ্য ছিলেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই উত্তর জীবনে শক্তিমান লেখক ও যশস্বী হইয়াছেন।

এই সভার সভ্য— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গোষ্ঠীপতি।
যোগেশচন্দ্র মজুমদার—কার্য্যাধ্যক্ষ।
গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—লিপিকার।
বিভূতিভূষণ ভট্ট—সভ্য।
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সভ্য।
নিরুপমা দেবী—অনুপস্থিত মহিলা সভ্যা।

কর্ম্ম পদ্ধতি—এই সভার কোন লিখিত বিবরণ রাখা হইত না এবং নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সভার কথা গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। এই সভার অধিবেশন প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইত। স্থান পুরাতন জিলা স্কুলের নালার পার্শ্ব। পরিশেষে পূর্ণ মাষ্টারের

তাড়নায় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া "ওয়েজফিল্ডের" মাঠ যেখানে বর্ত্তমান টাউন হল—সেইখানে অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইত। প্রতি অধিবেশনের জন্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি লিখিত হইত, পরে সমালোচনা হইত, নম্বর দেওয়া হইত। এই সাহিত্য-সভার জন্য শরৎচন্দ্র লিখিলেন 'কাশীনাথ', 'বোঝা', 'চন্দ্রনাথ', 'বড়দিদি', 'দেবদাস' এবং আরও কয়েকটী গল্প। ইহাদের মুখপত্র স্বরূপে একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা "ছায়া" প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন—যোগেশচন্দ্র এবং লিপিকার গিরীন্দ্রনাথ। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতন সুন্দর। তাঁহাকে 'প্রেস্' বলা হইত। ইহার কয়েক খণ্ড ফনীন্দ্রনাথ পাল 'যমুনা' পত্রিকার জন্য লইয়া যান। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহার কয়েক খণ্ড পাঠ করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সৌরীন মুখোপাধ্যায়ও "ছায়া" পত্রিকার হস্তলিখিত অংশ পাঠ কবিয়াছেন। ফনীন্দ্রনাথ পাল "যমুনা" পত্রিকার জন্য কয়েক খণ্ড লইয়া যান, তাহা পুনরায় দেখা যায় নাই।

১৮৯৬ সালে শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী পরলোক গমন করেন।এই বৎসর নানা কারণে তাঁহার এফ, এ, পরীক্ষা দেওয়া হইল না। মাতামহের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহার

পিতা শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া খঞ্জরপুরে নন্দা ধোপীর বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শরৎচন্দ্র কলেজ ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে রাজবনেলী ষ্টেটের বাবু শিবশঙ্কর সহায়এর সহকারী রূপে কিছুকাল কাজ করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার বলেন যে বনেলী ষ্টেটে কাজ করার সময় শরৎচন্দ্র মাদক দ্রব্যাদির সেবা আরম্ভ করেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ভাগলপুরের প্রমথনাথ ঘোষ, উপীলা ভাতুড়ী, শরৎচন্দ্র মজুমদার, কুমার সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলদেব। তাঁহারা শরৎচন্দ্রের জীবনে বহুভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সে প্রভাবের ফল সর্ব্বভাবে শুভ ছিল না। শিবশঙ্কর বাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র সাঁওতাল পরগণা পরিভ্রমণ করেন। সেই চিত্র আমরা 'শ্রীকান্তে' ও 'চরিত্রহীনে' দেখিতে পাই। কিন্তু এই জমিদারী চাকরীর বৈচিত্র্যবিহীন জীবন শরৎচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। শরৎচন্দ্র আদমপুরে কুমার সতীশচন্দ্রের নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া, শরৎ মজুমদারের কারখানায় সহকারীর কাজ করিয়া, ক্রিকেট খেলিয়া, নিজেকে শুষ্ক তরল আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া দেন। এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট জীবন যাপন ব্যপদেশে শরৎচন্দ্র নানা প্রকার মানব চরিত্রের সংস্পর্শে বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভাগলপুরের অলস কর্ম্মহীন

জীবন তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না। অকস্মাৎ একদিন রাজু তাঁহার বন্ধু, সখা, মিত্র, তথা 'ইন্দ্রনাথ' নিরুদ্দেশ হইয়া গেল; বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাব সন্ধান পাওয়া গেল না। শরতের ভাগলপুরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিছুকাল পরে, বোধ হয় ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র সামান্য পারিবারিক মনোমালিন্যের সুযোগে ভাগলপুর ত্যাগ করেন এবং হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে মজঃফরপুরে উপস্থিত হন। কিয়ৎকাল মধ্যেই ৺ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের অনুসন্ধিৎসার ফলে তাঁহার ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুরের স্মৃতি বিষয়ক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বহু সংবাদ দিয়াছেন। মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত নৈপুণ্য-গুণে তাঁহার বহু সঙ্গীত-বন্ধু জুটিল। বন্ধু মহাদেবের গৃহে শবৎচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীতের আসর অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার একটী খণ্ড চিত্র দেখিলাম আমরা 'রাজলক্ষ্মীর' পবিচয়ের অন্তরালে। মজঃফরপুরের তরল আনন্দের মধ্যেও শরৎচন্দ্র অবসব মুহূর্ত্তে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। 'ব্রহ্মদৈত্য' নামক একখানি বিরাট উপন্যাস মজঃফরপুরে বচনা করেন। এমন সময় হঠাৎ পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মজঃফরপুর ত্যাগ করেন এবং ভাগলপুরে আসেন। পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে

পরিবারের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করেন। আত্মীয়গণ শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে তাঁহাকে কোন সাহায্য করে নাই। অতিকষ্টে কিছু-কাল অতিবাহিত করিয়া হঠাৎ কনিষ্ঠা ভগ্নী 'মুনিয়া'কে অবাঙ্গালী বাড়ীওয়ালীর অনিশ্চিত স্নেহের নিকট ফেলিয়া কলিকাতা যাইতে বাধ্য হন। সেখানে আত্মীয় লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের হিন্দি দলিল পত্রাদি ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কলিকাতায়ও বিশেষ কোন কারণে বেশী দিন বাস করিতে পারেন নাই। বাধ্য হইয়া তাঁহার মেশোমহাশয় অঘোরবাবুর নিকট রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। অঘোরবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পরে প্রথম ২ বৎসর ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষু বেশে * (২) ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৫ সালে কার্য্য লাভ করিয়া আট দশ বৎসর অতিবাহিত করেন,

* (২) শরৎচন্দ্র জীবনে পাঁচ বার সন্ন্যাসীবেশ গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের উপর শরৎচন্দ্রের কোন বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। সন্ন্যাসীর পরিব্রাজক অংশের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপন্যাসের ভিতর সন্ন্যাসীকে বিরাট আসন দান করিয়াছেন। অন্য দিকে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে' সন্ন্যাসী মহারাজের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—
"যস্য ভাবনা যাদৃশী।"

(১৯০৩-১৯১৩)। এই ব্রহ্ম প্রবাসের চিত্র আমরা পাই 'শ্রীকান্তে' এবং 'চরিত্রহীনে'। এইবার ভাগলপুরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক পরিত্যক্ত হইল।

ব্রহ্মদেশ ত্যাগের পর তিনি বাঙ্গলা দেশে বাসকালে ভাগলপুরে কয়েকবার আগমন করেন।

শরৎচন্দ্র যখন 'দেবদাস' প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদ শাখার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। এবং 'দেবদাসে'র বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ দান করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (গুরুদাস লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী) তাঁহাব সহিত এই অর্থের বিষয় আলোচনা করেন। সুরেন্দ্রবাবু বলেন যে ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মজ্জাগত বিবাদের জন্যই এই অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ শরৎচন্দ্রের পুস্তকস্পর্শে সাহিত্য পরিষদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই ব্যাপারের পরে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের প্রতি রুষ্ট হন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে শরৎবাবু ভাগলপুরে আসিলে বাঙ্গালীটোলার ৺ কালীস্থানের জন্য ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পুস্তক দান করিতে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র তাহা অতি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান

করেন। মাত্র একবার শরৎবাবু প্রকাশ্যভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৯১৮ সালে অভিভাষণ দান করেন। এইবারও তাঁহার ভাগলপুর জীবনের ঘটনা বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার অশোভন আলোচনা হয়—এমন কি রেঙ্গুনসঙ্গিনী বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা এই বিষয় লইয়াও রুচি বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তাহাতে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ভাগলপুরের প্রতি শরৎচন্দ্র যতই বিরক্ত থাকুন না কেন, তাঁহার অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় ভাগলপুর-প্রীতি বিজড়িত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার কৈশোরের চঞ্চল খেলাঘর, প্রথম যৌবনের সীমাহীন আবেশময় স্মৃতিগুলি এবং কর্ম্মময় জীবনের প্রথম পরিচয়ের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘটনাবলির মধ্যে ভাগলপুরের বহুস্মৃতি বিজড়িত হইয়াছে। শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বের গঙ্গাতীরের চিত্র, শাহজীর কল্পিত কবর স্থান, শ্মশান ও শ্মশানের দৃশ্য, গঙ্গায় মৎস্য শীকার ভাগলপুরেরই চিত্র। 'শ্রীকান্তে' সরকার বাড়ীর যাত্রায় 'মেঘনাদের একহাতে ছিন্ন কটিবাস অন্য হাতে কেবলমাত্র ধনুর্ব্বান চালনার' কৌতুক-বহ কাহিনী এইখানকার ঘটনা। 'বহুরূপী' বাঘ ভাগলপুরে বাঙ্গালীটোলার চালাঘরের পাশেই লুকাইয়া ছিল। দর্জ্জিপাড়ার নূতনদা'র সেই স্বার্থপরতার জীবন্ত ছবি, শরৎসাহিত্যের হাসির

রত্ন, ভাগলপুরের খনি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। 'চরিত্র হীনের' প্রারম্ভে প্রথম লাইনটী 'পশ্চিমের একটী সহরে তখনও শীত পড়ি পড়ি করিয়াও পড়িতেছিল না'—এই সহরটী ভাগলপুরেরই কল্পনা বলিয়া মনে হয়—বিশেষ করিয়া দিবাকর যেখানে গঙ্গাতীরে নামিয়া পুনরায় অবহেলার পূজা শেষ করে, সেইখানকার বর্ণনায়। 'দেবদাসে' পার্ব্বতীর সঙ্গে বাঁশবনে তাম্রকূট সেবনের ঘটনাও ভাগলপুরের গঙ্গাতীরে 'গোলকুটীর' বাঁশবনের অন্তরালে লুকাইয়া তাম্রকূট সেবনের চিত্র।

আভাস

শরৎচন্দ্র অবিবাহিত কিংবা বিবাহিত এই প্রশ্নের সমাধান না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে নারীর প্রতি তাঁহার সহজ আকর্ষণ প্রবলতম। নারী-মনের সন্ধানে শরৎচন্দ্র নারী জগতের বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম প্রবাস কালে 'বেঙ্গল সোসিয়াল ক্লাবে' স্বরচিত 'নারীর ইতিহাস' পাঠ করেন এবং 'সাতশত পতিতা নারীর জীবন কাহিনী সম্বলিত' একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থ নারীর প্রতি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রমাণ করে। ঘটনা বিপর্য্যয়ে শরৎচন্দ্র প্রথম যৌবনে সমাজ সম্পর্ক চ্যুত হন; অতএব নারীর

সঙ্গে তাঁহার পরিচয় সাধারণতঃ সমাজের বাহিরে। শৈশবে ও কৈশোরে পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নারীর প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার নিয়ম বন্ধনের কাহিনী। নারী জগতের সেই অভিজ্ঞতা টুকুকে শরৎবাবু তাঁহার স্বাভাবিক দরদে সিঞ্চিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পরিবারের বাহিরে সমাজ গোষ্ঠীর অপর প্রান্তে যে সমস্ত নারীর সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরই সত্য, অর্দ্ধ সত্য অথবা কল্পনানুরঞ্জিত ছায়া শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠককে প্রীতি-উপহার দিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নারী-প্রগতি-প্রচেষ্টাকে বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে সুপরিচিত করিয়া দিতেছিল। ব্রাহ্ম প্রভাবে তখন বাঙ্গালী হিন্দুগণও নূতন আদর্শের মোহে নূতন সমাজ গঠনের প্রয়াস করিতেছিল। এই সময়ই শরৎচন্দ্রের জীবনের গঠন সময়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তথা নারী স্বাতন্ত্র্যবাদের পরোক্ষ প্রভাব শরৎ সাহিত্যের সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

শরৎচন্দ্রের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, অনুভূতি সূক্ষ্ম, দরদ অপরিসীম, কথোপকথন মধুর, শব্দবিন্যাস অনবদ্য, প্রকাশ

ভঙ্গিমা অনুপম, পরিস্থিতি-সৃষ্টি সহজ, তাই শরৎচন্দ্র যাহা কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, অথবা বুঝিয়াছেন, তাহা অপরূপ ঘটনাজালে কথা সাহিত্যের আবরণে বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরন্তন করিয়া দিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাসের ভিতর দিয়া তদানীন্তন সমাজসম্মত আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঔপন্যাসিকগণ পার্থক্য বোধে কতকগুলি নষ্ট-চরিত্র নারীর সমাবেশ করিয়াছেন। সেই চরিত্রগুলি সমাজ কল্যানকর শুভ চরিত্রের প্রচ্ছদপট রূপে সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। যথা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের' উইলে রোহিনী অথবা 'বিষবৃক্ষের' কুন্দনন্দিনী; তাহারা আখ্যানভাগের পাপগ্রহমাত্র। 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মনের কোন সন্ধান লইতে চেষ্টা করেন নাই। প্রতাপকে ভালবাসিবার অপরাধে শৈবলিনীকে নরক দর্শন রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা' বিবাহিতা সন্ন্যাসিনী। আনন্দমঠে 'শান্তি'কে নারীরূপে পুরুষের পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সকল সময়ে কাজ করাইতে সাহস করেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে নারী মনের গোপন কথার স্পষ্ট প্রকাশের কোন চেষ্টা হয় নাই। শূদ্রক প্রণীত 'মৃচ্ছকটিকে'

বসন্তসেনার চারুদত্ত-প্রীতি নির্ম্মল; মনোবিশ্লেষণের দিক দিয়া বসন্তসেনা বৈচিত্র্যবিহীনা। বাণভট্টের 'কাদম্বরীর' পত্রলেখা অসম্পূর্ণ নারী। কালিদাস শকুন্তলার মুখে একটী বারও কোন ভাবব্যঞ্জক কথা ফুটাইয়া তোলেন নাই। 'বিল্বমঙ্গলেই' আমরা প্রথম নষ্টা নারীর মনের অপর দিক দেখিতে পাই। বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে বহু বারবিলাসিনীর চিত্র আছে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই পরিশেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে। তাহাদের মনোধারার গতি ধর্ম্মাভিমুখী। বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিতে' বিনোদিনীর ভিতর বিধবা নারীর মনের অতৃপ্ত বাসনার অস্পষ্ট আভাস পাই। দ্বিজেন্দ্রলাল 'পরপারে' নাটকে শান্তার ভিতর পতিতা নারীর ত্যাগের এক মহিমময় দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। *(৩)

* (৩) বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভিতর বৈষ্ণব কবিগণ বিভিন্ন রূপে নারী মনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনদের দৃষ্টি দেহাতিরিক্ত অতীন্দ্রিয়। তাঁহাদের আদর্শ ও পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন জগতের। সুতরাং তাঁহারা আমাদের আলোচনা বাহিরে।

যৌবনের প্রারম্ভে সমাজে আত্মীয় স্বজনের দ্বারে শরৎ-চন্দ্রের প্রবেশ নিষেধ ছিল। অথচ স্নেহমমতার জন্য শরৎচন্দ্রের মন সততই উন্মুখ ছিল। তাই সমাজের বাহিরে সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন স্নেহমমতা। বাঙ্গলাদেশের কোন প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মতন সমাজ বহির্ভূত নারীর সংবাদ লাভের সুযোগ পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। যখনই যে অবস্থায় ছিলেন কোন না কোন নারী সকল সময়ে তাঁহার ললাটে স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিয়াছে। আমাদের ধারণা শরৎচন্দ্রের মনের অবচেতন স্তরে একটী শাশ্বত নারী ছিল। তাহার প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল অপরিসীম; জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় সেই নারীটী বিভিন্ন রূপে শরৎসাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের স্বভাবেও অমন কতগুলি নারী-বাঞ্ছিত গুণ ছিল যাহাতে নারীরা তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিত, সহজ সহানুভূতি-বিগলিত হইয়া তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিত। অন্য লেখক যাহা বিচার দ্বারা মস্তিষ্ক দ্বারা অর্জ্জন করেন, শরৎচন্দ্র তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাই শরৎচন্দ্রের আলেখ্যগুলি ব্যক্তিগত স্পর্শে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

আমাদের আলোচনার বিষয় শরৎ সাহিত্যে 'পতিতা' নারীর মনোবিশ্লেষণ।

পতিতা পর্য্যায়—

শরৎ সাহিত্যের পতিতাকে স্থূল দৃষ্টিতে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথাঃ—

(১) বারাঙ্গনাঃ— 'দেবদাসের' চন্দ্রমুখী, 'শ্রীকান্তের' পিয়ারী বাইজী, 'আঁধারে আলোর' বিজলী।

(২) গৃহত্যাগিনী বিধবাঃ-'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী ও কিরণময়ী, 'শেষ প্রশ্নের' কমল, 'শেষ পরিচয়ের' সারদা, 'শ্রীকান্তের' কমললতা।

(৩) গৃহত্যাগিনী সধবাঃ–'গৃহদাহের' অচলা, 'শেষ পরিচয়ের' সবিতা, 'স্বামীর' সৌদামিনী, 'বিরাজ বৌ' এর বিরাজ।

(৪) নীরব প্রেমিকাঃ–'পল্লী সমাজের' রমা, 'বড়দিদির' মাধবী, 'শেষ প্রশ্নের' নীলিমা।

(৫) কুমারীঃ— 'দেবদাসের' পার্ব্বতী, 'পথনির্দ্দেশের' হেমনলিনী।

ইহার বাহিরেও কয়েকটী চরিত্র আছে যাহা কোন বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত নহে। তাহারা শরৎ-সাহিত্যের মনস্তত্ত্বের কোন সন্ধান দেয় না—যেমন নন্দ বোষ্টম, টগর, মোক্ষদা, বিধু, মুক্ত ইত্যাদি। ইহারা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ছিল, আছে এবং থাকিবে।

শরৎ সাহিত্যের মনস্তত্ত্বের বিচার দুই প্রকারে সম্ভব;—প্রথমতঃ ধারাবাহিক বিভাগ, দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী বিভাগ। চিন্তার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শরৎ সাহিত্যের ধারাবাহিক বিচারের অসুবিধা এই যে শরৎবাবু এক সঙ্গে একাধিক উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন এবং কয়েকখানি উপন্যাস বহু পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া বহু পরে শেষ করেন ও প্রকাশ করেন। যদি শরৎবাবুর পাণ্ডুলিপিতে দৈনন্দিন লেখার নির্ঘণ্ট পাওয়া যাইত, তবে তাঁহার চিন্তাধারার ও ক্রমবিকাশের সুন্দর ইতিহাস করা সম্ভব হইত। সুতরাং সময় নির্দ্দেশের অভাবে আমরা পতিতার শ্রেণী বিভাগ করিতে বাধ্য হইব।

আখ্যায়িকার অবতরণিকা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে শরৎবাবুর বর্ণিত প্রত্যেকটী চরিত্রহীনার চরিত্রে এমন একটী শোভন দিক আছে যে তাহাদিগকে সাধারণ পতিতা

নারীর পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অথচ সমাজের যে আদর্শের ভিতর এই সকল নারী গড়িয়া উঠিয়াছে—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহারা প্রায়ই সেই সমাজের নিয়ম-বন্ধনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। তথাপি এই অবাঞ্ছিত আবেষ্টনীর মধ্যেও শরৎবাবুর সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটী নারীরই এমন একটা দেহাতিরিক্ত আবেদন রহিয়াছে যে তাহারা প্রতি চিন্তাশীল পাঠকেরই সহজ সহানুভূতি ন্যূনাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। যে দিকটায় সমাজের দৃষ্টি পরাঙ্মুখ, সেই দিকটীই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির অভিমুখ। * (৪)

---

* (৪) 'পতিতা' শব্দটী সামাজিক অর্থে গৃহীত হইয়াছে। 'পতিতা' হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে 'সতী' শব্দের বিপরীত অর্থ বোধক পরিভাষা। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের নির্দ্দেশ অনুসারে নারী 'এক পতিভাগা'। বিবাহমন্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বামীই একমাত্র গ্রহণীয় পুরুষ; সুতরাং হিন্দুসমাজে নারীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। দেহে ও মনে নারী একটী মাত্র পুরুষকে সাধনা করিতে পারে। সমাজের সূক্ষ্ম বিচারে স্বামী ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের কামনা-কলুষ স্পর্শ নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করে। দেহ কিংবা মন কোনটীই হিন্দুনারীর পক্ষে পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। মনে মনেও যদি বিবাহিতা হিন্দুনারী পরপুরুষকে কল্পনা করে, তবু সে পতিতা। এই অর্থে 'পতিতা' শব্দ ব্যবহৃত হইল।

বারাঙ্গনা

চন্দ্রমুখী

দেবদাসের চন্দ্রমুখী শরৎ-সাহিত্যে প্রথম পরিচিতা বারাঙ্গনা। যে ভাবে দেবদাসের সহিত চন্দ্রমুখীর প্রথম পরিচয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় শৌণ্ডিকালয়ে প্রথম পরিচয়ের দ্বিধা, সঙ্কোচ, জড়িমা, সংস্কারের আঘাত, বিবেকের তাড়না যেন লেখকের জীবনের বাস্তব ঘটনা। মাত্র মানস চক্ষে বিচার বুদ্ধি দ্বারা চন্দ্রমুখীর পরিচয়ের কাহিনী অমন জীবন্ত ভাবে বলা সম্ভব কিনা জানি না। পার্ব্বতীর প্রত্যাখ্যান যদিও চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দেবদাসের পরিচয়ের প্রচ্ছদপট, তথাপি চন্দ্রমুখীর ব্যক্তিগত আকর্ষণের দাবীও দেবদাসের জীবনে কম

প্রভাব বিস্তার করে নাই। মাত্র চন্দ্রমুখীর দেহ-বিলাসই দেবদাসকে মুগ্ধ করে নাই। চন্দ্রমুখীর সহৃদয় ব্যবহার, সমাহিত আলাপ, দেবদাসকে সুপথে লওয়ার আন্তরিক চেষ্টা স্নেহবুভুক্ষু দেবদাসের মনে অধিকতর মোহ বিস্তার করিয়াছিল। দেবদাস যেমন চন্দ্রমুখীর দেহকে কেন্দ্র করিয়া পিচ্ছিল পথে নামিতেছিল, অন্য দিকে পার্ব্বতীও দেবদাসকে আলোক-বর্ত্তিকা নির্দ্দেশ করিয়া সত্য প্রেমের পথে অগ্রসর হইতেছিল। যে চন্দ্রমুখী একদিন মাত্র দেহের আবেদনে রূপের পসরা সাজাইয়া সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, সে আজ দেবদাসকে কেন্দ্র করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমের সন্ধানে সমস্ত বিলাস, বিভ্রম ও ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিল। হিন্দু ঘরের বিবাহিতা নারী যেমন বিবাহান্তে স্বামীর চরণে নিজকে নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দেয়, চন্দ্রমুখীও দেবদাসকে দেবতার আসনে বসাইয়া নিজকে নিঃস্ব করিয়া দিল দেবদাসের চরণে। চন্দ্রমুখী অঙ্গারের মতন শতধৌত হইয়াও তাহার মলিনত্ব ঘুচাইতে পারিল না, কারণ সমাজ তাহার দুঃখাভিশপ্ত ললাটে কলঙ্কতিলক পরাইয়া দিয়াছে। সে যে বারাঙ্গনা— পতিতা। অন্যদিকে শ্রীমতী পার্ব্বতী সমাজের প্রয়োজনে বৃদ্ধ দ্বিতীয় পক্ষ স্বামীর নিকট দেহ সমর্পণ করিল। কিন্তু তাহার

মন পড়িয়া রহিল দেবদাসের নিকট । পার্ব্বতীর সমস্ত আত্ম-নিগ্রহ, পারিবারিক নিষ্ঠা খসিয়া পড়িল দেবদাসের শবদেহের সন্ধানে । শরৎচন্দ্রের পাঠক পরোক্ষে প্রশ্ন করিল পতিতা কে ?

পিয়ারী বাইজী (রাজলক্ষ্মী)

শরৎ-সাহিত্যে বারাঙ্গনা-সান্নিধ্যে প্রথম পরিচয়ের দ্বিধা, সঙ্কোচ, জড়তা অচিরে কাটিয়া গেল। মজঃফরপুরে বন্ধু মহাদেবের গৃহে পিয়ারী বাইজীর সম্মুখে শ্রীকান্ত বেশ প্রকৃতিস্থ। মদ্যপের অর্থহীন প্রলাপ-উক্তি, লম্পটের অভদ্র ইঙ্গিত এবং নর্ত্তকীর বিলোল আভাস শ্রীকান্তকে আর বিভ্রান্ত করে না। পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হইল। শৈশবের খেলার সাথী আজ যৌবনের অভিসারিকা। ভদ্র গৃহে জন্ম, ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহিতা রাজলক্ষ্মী অবস্থা-বিপর্য্যয়ে নর্ত্তকী, দেহ-বিলাসিনী। রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাতের চিত্র শ্রীকান্তের অসীম কৌতুকাবহ মনোরম কাহিনী । শৈশবের প্রত্যক্ষ পরিচিতার সহিত অবাঞ্ছিত স্থানে শুভদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির অন্তরালে রাজলক্ষ্মী আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার বহুদিন-বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনকে সে খুঁজিয়া পাইল। বার-বিলাসিনী (?) নর্ত্তকী জীবনকে রাজলক্ষ্মী কখনো স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করে নাই। পিয়ারী বাইজী আর রাজলক্ষ্মী ভিন্ন জীব। জীবিকা অর্জ্জনে রাজলক্ষ্মী হইল পিয়ারী বাইজী; ব্যবসা ব্যপ-

দেশে নিজের দেহকে সে অপবিত্র করিয়াছে। সমাজের চক্ষে সে হীনা, আত্মীয় স্বজনের নিকট রুদ্ধদ্বার। অথচ, অদ্ভুত এই রাজলক্ষ্মী অসাধারণ বুদ্ধিমতী, অপরূপ সুন্দরী, দানে সম্রাজ্ঞীর মত মুক্তহস্তা, সংযমে পাবমিতা। সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়াও রাজলক্ষ্মী কখনো সমাজ-বন্ধনকে পায়ে দলিত করিতে চেষ্টা করে নাই। (কিরণময়ীর মতন, কমলের মতন ব্যক্তিত্বের জোরে সমাজকে অযথা আঘাত করে নাই।) 'বঙ্কু'কে কেন্দ্র করিয়া রাজলক্ষ্মী আবার নূতন করিয়া পবিত্যক্ত সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকান্ত কত রকমে রাজলক্ষ্মীকে নিকটে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহার উচ্ছিষ্ট দেহ ধ্যানের দেবতাকে উৎসর্গ করিতে পারিল না। নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি রাজলক্ষ্মীকে প্রতি নিয়ত পীড়িত করিত, লজ্জা দিত। নিপুণ হস্তের সেবা-দ্বারা আজন্ম সেবা বঞ্চিত শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী আকৃষ্ট করিল। পরমতম আত্মীয়তার দ্বারা গৃহহীন শ্রীকান্তকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিল। রাজলক্ষ্মী স্নেহ-মমতা, যত্ন ও স্মৃতির বন্ধনে শ্রীকান্তকে এমন অভিভূত করিল যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর স্থানে অন্য কাহাকেও কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মধ্যে জ্বালা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, প্রিয়তমকে সুখী করাই রাজলক্ষ্মীর নারী

জীবনের চরম চরিতার্থতা। (অভয়া ও কমললতার শ্রীকান্ত-প্রীতি রাজলক্ষ্মীকে ঈর্ষাহত করে নাই।) রাজলক্ষ্মীর বিরাট মন মাত্র প্রেমাস্পদ শ্রীকান্তকে সুখী করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। সতীন পুত্র বঙ্কুকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিল; জলহীন গ্রামে জলাশয় খনন করিল; বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিল; অপরিচিত দুঃস্থ পথিককে রেলগাড়ীতে ডাকিয়া যে সহৃদয়তা দেখাইল, তাহা সকল সহৃদয় পাঠকের প্রাণে রাজলক্ষ্মীর প্রতি সহজ সহানুভূতি সঞ্চার করে।

· রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের নিকট কি প্রত্যাশা করিত? কিসের জন্য সে 'শ্রীকান্তের পশ্চাতে নির্লজ্জার মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল'? শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কি কর্‌লে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে?" রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে রোহিনী-অভয়ার জীবন যাত্রার আভাস দিল। শ্রীকান্ত বলিল, "লক্ষ্মী, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে পারি। কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে"? * (৫) শ্রীকান্তের কথা শুনিয়া

---

(৫) * চন্দ্রমুখী এক দিন দেবদাসকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে যাত্রার সময় বলিয়াছিল, 'তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।' দেবদাস উত্তর দিল, 'ছিঃ তা হয় না। আর যাই করি, এত বড় নির্লজ্জ হইতে পারবো না।'

রাজলক্ষ্মীর অস্পষ্ট ধারণাগুলি পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বলিল শ্রীকান্তকে, "তোমাকে আমি এত দিন যা' ভেবেছিলুম তা' ভুল।" যদি স্বগ্রামে স্বগৃহে প্রসন্ন ঠাকুর্দার নিকট শ্রীকান্ত নিজেকে রাজলক্ষ্মীর স্বামী বলিয়া পরিচিত না করিত; তবে এইখানেই রাজলক্ষ্মীর জীবনের এক অঙ্কের যবনিকা পতন হইয়া যাইত। সেই শ্রীকান্তের স্ত্রী পরিচয় কি রাজলক্ষ্মীর আনন্দের না দুঃখের?

বঙ্কুকে বিবাহ দিয়া শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী এক রকম অপমান করিয়াই গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পরে আবার তাহাকে একান্ত ভাবে পাইবার জন্যই 'গঙ্গামাটী'তে আসিল। কিন্তু 'সুনন্দা'র সংস্পর্শে আসিয়া 'কৃতকর্ম্মের দুঃসহ-ভারে রাজলক্ষ্মীর সর্ব্বদেহ মনে যে বেদনার আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সম্বরণ করিবার পথ সে খুজিয়া পাইতেছিল না'। অবাঞ্ছিত জীবনাবেষ্টনীর মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য কি বিরাট ব্যাকুলতা! নিস্ফল জীবনকে সফল করিবার জন্য সুনন্দার সাহচর্য্যে রাজলক্ষ্মী এবার ব্রতচর্য্যা আরম্ভ করিল। নবীন সন্ন্যাসী বজ্রানন্দকে ভ্রাতৃত্বের দাবীতে আপনার কাছে টানিয়া লইল। পরিশেষে পাপবিদ্ধ জীবনের পাপস্খালনের জন্য গুরুদেবের চরণে শরণ লইল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গুরুর মন্ত্র অপেক্ষা পতিতার প্রেমের নিষ্ঠাই জয়ী হইল।

অভয়া

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে অভয়ার পরিচয় পরোক্ষ। শ্রীকান্তের পত্র ছিল দুইটী সহমর্ম্মী অপরিচিতার পরিচয়ের দূত। রাজলক্ষ্মীর পত্রোত্তরের ভিতর দিয়া তাহার কত দরদ, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত সম্মান ফুটিয়া উঠিয়াছিল অভয়ার প্রতি। অভয়ার পারিবারিক জীবন অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সমাজের দিক দিয়া, রোহিনীর সঙ্গে একাকী গমন—হউক না তাঁহার উদ্দেশ্য স্বামী সন্ধান—এবং ব্রহ্মদেশে রোহিনীর সঙ্গে একত্র বাস—এই উভয় কারণেই অভয়ার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল বৈকি? কিন্তু যে রাজ্য সমাজের নিয়ম বন্ধনের বাইরে, যে রাজ্যের সীমারেখান্তে মাত্র দেহের নিবেদনই পঁহুছায় না, সেই রাজ্যের মহামহিম দৃষ্টি দিয়াই রাজলক্ষ্মী অভয়াকে বিচার করিয়াছে এবং শ্রীকান্তকে বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীই একমাত্র অভয়াকে বিচার করিতে পারে, শরৎচন্দ্রও পরিপূর্ণ মনে স্বচ্ছন্দভাবে রোহিনীর অভয়ার সঙ্গে বিবাহ-বিহীন বন্ধন অনুমোদন করিতে পারেন নাই। অথচ অভয়ার যুক্তিকেও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। সুতরাং রাজলক্ষ্মী নারী, তাহাকেই নারীর বিচারের ভার দিলেন। একদা

শরৎবাবু বলিয়াছিলেন—'নারীই নারীর অপযশের জন্য অর্দ্ধেক দায়ী'। তাই বোধ হয়, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে অভয়ার বিচারের ভার দিলেন। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বিরাট হৃদয়ের সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই এবং রাজলক্ষ্মীর বিচার শক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার উপর অসীম আস্থা ছিল বলিয়াই রাজলক্ষ্মীকে অভয়ার বিচারের ভার দিলেন। * ৬) 'স্বামী পরিত্যাগ পাপের সীমা নাই'—এই সংজ্ঞা স্বীকার করা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে লিখিয়া জানাইল, "অভয়ার বিচার একটু সাবধানে করিয়ো—আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তার পাপ পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া বসিয়ো না।" শ্রীকান্ত অভয়াকে জানাইল,

* (৬) শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম দুই পর্ব্বে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সহজ; জড়তা নাই, আড়ষ্ট ভাব নাই। কথাবার্ত্তার সঙ্গে জীবনের ঘটনার সুসঙ্গতি আছে। কিন্তু তৃতীয় পর্ব্বে ও চতুর্থ পর্ব্বে রাজলক্ষ্মীর জীবন চলচ্চিত্রের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের মতন চলিয়াছে—যেন কিছুই প্রাণবন্ত নহে। বার্দ্ধক্যে শরৎচন্দ্রের চিন্তা শক্তির দুর্ব্বলতা শেষ দুই পর্ব্বের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সে স্পর্শ প্রথম দুই পর্ব্বকে রসমধুর করিয়াছে, সেই রস যেন নিঃশেষে ক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের সে মধুরতা কোথায়? রাজলক্ষ্মীর জীবন-যন্ত্রের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে—শুধু বাহির হইতে জোর দিয়া কি সে যন্ত্র চালিত করা যায়? শেষ দুই পর্ব্ব ত শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর লক্ষ্য-বিহীন ব্যঙ্গ উক্তি মাত্র।

'রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে'। অভয়ার সঙ্গে অন্নদা দিদির পার্থক্য ঐখানে যে অন্নদা দিদি নিষ্ফলতার মধ্যে নিজকে সম্পুর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু অভয়া সেইটুকু করে নাই।

বিজলী প্রারম্ভে 'আঁধারে আলোর' বিজলী নিতান্তই বারাঙ্গনা। জমিদারপুত্র অনভিজ্ঞ সত্যেন্‌কে বিজলী গঙ্গাতীরে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল, সুন্দর দেহ বিনিময়ে সে বহুপুরুষকে আকর্ষণ করিয়াছে। দক্ষ মৎস্য শীকারীর মতন বিজলী সত্যেন্‌কে খেলাইয়া তীরে তুলিতে চেষ্টা করিল। বিজলী মনে করিয়াছিল চক্ষের চমকে সত্যেন্‌কে চমৎকৃত করিয়া দিবে। একদা ছল করিয়া বিজলী সত্যেন্‌কে তাহার গৃহে আহ্বান করিল। সত্যেন্ গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিল যে সে বারাঙ্গনা-গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। বিজলী মনে করিয়াছিল সত্যেন্ অন্যান্য পুরুষের মতন দেহ-লোলুপ। কিন্তু অতর্কিতে বিজলী আজ প্রথম দেখিল তাহার দেহ সীমা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—পুরুষ সত্যেন্। এতদিন বিজলী নিজের চারিপার্শ্বে আঁধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল, আঁধারই দেখিয়াছে। আজ জীবনে "আঁধারে আলোর" প্রথম সন্ধান পাইল। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা"।

বিজলী চন্দ্রমুখীর মতন 'অমৃত স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে'; বিজলী বাইজী 'পারিজাত স্পর্শে' মরিয়াছে। চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখীও একদিন দেবদাসের স্পর্শে মরিয়াছিল। কে বিশ্বাস রাজলক্ষ্মী করিতে পারিত যে 'বিজলী রূপের ভাণ্ডার দেহটাকে একখণ্ড বিজলী গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে'? কিন্তু সত্যই সে ত্যাগ করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী একদিন কাশীতে মরিয়াছিল; মরিয়া বাইজী হইয়াছিল। অন্যদিকে চন্দ্রমুখী মরিয়া মানুষ হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর ভিতরে গৃহিনী সুলভ (Matronly) একটী মাতৃভাব স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রাজলক্ষ্মীর ভিতর স্নেহের দিকটা প্রবল। সে সব সময় শ্রীকান্তের চতুস্পার্শ্বে স্নেহের আবেষ্টনী গড়িয়া তুলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। রাজলক্ষ্মীর অধিকার বোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাইয়াছিল স্বামী ব্যতিরিক্ত সর্ব্বভাবে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে অতি নিকটে পাইয়াছে; তাঁহার রোগে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। দয়িতের সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছে। দেবদাস চন্দ্রমুখীকে বলিয়াছিল, "মৃত্যুর পরে যদি আবার কখনো মিলন হয়, আমি কখনো তোমা' হ'তে দূরে স'রে থাক্‌তে পারবো না"। দেবদাস তাহাকে 'বৌ' সম্বোধন করিয়াছিল,—চন্দ্রমুখী নিজকে সফলকাম মনে

করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। বিজলী কিন্তু সত্যেন্‌কে কোন ভাবেই নিকটে পায় নাই; পাইয়াছে অপমান। শেষ পর্যান্ত সত্যেন্ তাহাকে অর্থের প্রলোভনে গৃহে আনিল অপমান করিতে। এই অপমানের মূলে ছিল শোধ-বোধ। কারণ সত্যেন্ ভুলে নাই যে একদিন ছলনা করিয়া গৃহে ডাকিয়া মদ্যপের সম্মুখ 'সঙ্' সাজাইয়া বিজলী তাহাকে অপমান করিয়াছিল। সত্যেনের স্ত্রী রাধারাণী সহৃদয়তা দ্বারা সে অপমানের তীব্রতাকে অনেকটা লাঘব করিয়া দিয়াছিল। বিজলীর হৃদয় সত্যেনের প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্যেনের প্রয়োজন তাহার রহিল না। রাধারাণীর নিকট সত্যেনের একটী ক্ষুদ্র ছবি যাচ্ঞা করিল। রাজলক্ষ্মী অথবা চন্দ্রমুখী কখনো দয়িতের নিকট হইতে অতখানি অপমান লাভ করে নাই। প্রিয়জনের প্রীতিলাভে তাহারা উভয়েই চরিতার্থ হইয়াছিল। দানে রাজলক্ষ্মী অতুলনীয়া; চন্দ্রমুখী ত্যাগে গরীয়সী; বিজলী কিন্তু সত্যেনের নিকট কোনরূপ প্রতিদান প্রার্থনা করে নাই। সেই নিস্পৃহ প্রেমই বিজলীকে মহীয়সী করিয়াছে। মোটের উপর শরৎবাবুর তিনটী বারাঙ্গনার পশ্চাতে ছিল নারীর প্রচ্ছন্নসত্তা এবং সেই প্রচ্ছন্নসত্তার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বারাঙ্গনার নুতন রূপ দেখাইয়া দিলেন।

তুলনা করিলে দেখা যায়, শরৎচন্দ্রের বর্ণিত সকল পতিতাই অনিন্দ্য সুন্দরী। রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী ও বিজলী তাঁহাদের সুন্দর দেহকে পণ্য সাজাইয়া সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্রমুখী এবং বিজলীর শৈশব, কিশোর ও বিবাহিত জীবনের কোন সংবাদ শরৎবাবু দেন নাই। উর্ব্বশীর মতন তাহারা দুইজনে পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। তাহারা নিতান্তই গণিকারূপে শরৎসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর শৈশব জীবনের স্মৃতিগুলি খুবই সহজ, সরস ও মধুর। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর শৈশবের জীবন, দেবদাস পার্ব্বতীর শৈশব জীবনের অনুরূপ। পাঠশালায় একসঙ্গে পাঠ করিয়াছে, পরস্পর প্রহার করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। একদিন রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বৈঁচির মালা দিয়া বরণ করিয়াছিল। শৈশবের সেই ক্ষুদ্র ব্যাপার রাজলক্ষ্মীর জীবনের চিরস্মরণীয় ঘটনা। তারপর চলিল রাজলক্ষ্মীর বিবাহের হাস্যকর প্রহসন। পার্ব্বতীও শৈশবের খেলার অন্তরালে দেবদাসকে ভালবাসিয়া ফেলিল। নারীর বিবাহের সংস্কার পুরুষের অপেক্ষা বহু পূর্ব্বেই আসে। জন্মের দিন নারী দশ বৎসর অগ্রিম বয়স লইয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। শৈশবের খেলাচ্ছলে কোন কোন পুরুষ নিজের অজ্ঞাতসারে এমন

অনেক কাজ করে যাহা নারী বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া অনেক কিছু ধারণা করে এবং নিজের জীবনের উপর আরোপ করে। রাজলক্ষ্মী ও পার্ব্বতী তাহাই করিয়াছিল। সেইখানেই তাঁহাদের ট্রেজেডী। অবশ্য রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের মজঃফরপুরে জমিদার গৃহে নৃত্যের আসরে সাক্ষাৎ না হইলে রাজলক্ষ্মীর জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইত কি না, তাহা আলোচনা এইখানে অবান্তর।

এই তিনটী বারাঙ্গনাই ভালবাসিয়া তাঁহাদের নারী-সত্ত্বা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে। প্রশ্ন হইল যে যদি কোন পতিতা সত্যই কাহাকেও ভালবাসে, তবে সে দয়িতের জন্য কতটুকু ত্যাগ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহার জীবন-যাত্রা কোন প্রণালী অবলম্বন করে? শ্রীকান্তর জন্য রাজলক্ষ্মী কতটুকু ত্যাগ করিয়াছে? রাজলক্ষ্মীর দান যথেষ্ট; ত্যাগ অনুপাতে কম। শ্রীকান্তের জন্য রাজলক্ষ্মী প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর নিকট অর্থের মূল্য ত বিশেষ কিছু নয়। সে সত্যই অতীত জীবন-ধারা ত্যাগ করিয়াছিল কি? তাহার পাটনা গৃহে শ্রীকান্ত দেখিল পূর্ণিয়ার জমিদার সঙ্গীত ও নৃত্য বিলাস করিতে আসিয়াছে। আর একবার কাশীতে শ্রীকান্ত দেখিল রাজলক্ষ্মী

আসিয়াছে—'জুড়ীগাড়ী আরোহিণী' 'বহু মূল্য অলঙ্কার ভূষিতা' 'চাকচিক্যশালিনী'। শ্রীকান্ত ব্যঙ্গ করিয়া অভিনন্দন করিল 'হে বাইজীকুলরাণী…………'' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে এই বিলাসিনী বেশে দর্শন করিয়া এত ক্ষুব্ধ হইল যে রাজলক্ষ্মীর কোন উত্তর পর্য্যন্ত শুনিতে স্বীকার করিল না। রাজলক্ষ্মীর অর্থদানে যেমন কার্পণ্য ছিল না, অর্থ অর্জ্জনেও তেমন বিশেষ কোন সঙ্কোচ ছিল না। অপর দিক দিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালবাসিল, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল। ব্যবসা ত্যাগের পর চন্দ্রমুখী পুনরায় পাপ আশ্রয় করে নাই। চন্দ্রমুখী বলিয়াছিল, 'লোভের জিনিষ যখন ইচ্ছা ক'রেই ত্যাগ করেছি তখন আর ভয় ছিল না'। চন্দ্রমুখী তাহার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কখনো অনুতাপ করে নাই। তাই ত অশ্বত্থঝুড়ি গ্রামে গিয়া সামান্য গৃহস্থনারীর মতন দানে ধ্যানে সহানুভূতিতে সমস্ত গ্রামবাসিকে মুগ্ধ করিয়া লইল। তার পর আর একবার সে কলিকাতায় গিয়া তাহার দেহকে সাজাইয়াছিল; কিন্তু কেন? চন্দ্রমুখী দেবদাসের ভ্রাতৃবধূ জলদবালার নিকট শুনিয়াছিল 'দেবদাসের চরিত্র কদর্য্য, কলিকাতায় মদ বেশ্যা নিয়াই আছে, মৃত্যু অতি নিকট।' চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিল; প্রিয়তমকে রক্ষা করিতে

হইবে। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ চাই-ই। যে ব্যবসা একবার শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল তাহারই বহিরাবরণ পুনরায় গ্রহণ করিতে হইল। মন ক্ষত বিক্ষত হইল কিন্তু এই অভদ্র স্থান ব্যতীত কোথায় দেবদাসের দর্শন লাভ সম্ভব? এই বেশ পরিবর্ত্তনে চন্দ্রমুখীর কোন আবিলতা ছিল না। সজ্জার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বিজলী সত্যেন্‌কে মুগ্ধ করিতে গিয়া কোন এক শুভ-প্রাতে 'গঙ্গাস্নাত গরদ পরিহিত—' সত্যেন্‌কে সঙ্গীত অর্ঘ্য দ্বারা বরণ করিয়াছিল,—

আজু রজনী হাম্ ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু,
দশ দিক ভেল নিরনন্দা।

সত্যেনের গঙ্গাস্নান, গরদ পরিধান ও বিজলীর সঙ্গীত দ্বারা শরৎবাবু একটী সুন্দর সুসঙ্গত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত সময়োচিত হইয়াছে। নর্ত্তকী বিজলী এই অলক্ষ্য অর্ঘ্য দানের সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের নূপুর খুলিয়া ফেলিল, বলিল, 'আর পারব না।' কিন্তু পরিশেষে একদা দুইশত মুদ্রা বিনিময়ে সত্যেনের পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবে আসিল বাধ্য

হইয়া, অনিচ্ছাকৃত অতি সাধারণ নর্ত্তকী বেশে; 'বাইরের দৃষ্টির আঘাত আর সহিতে পারিতেছিল না। দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছিল'। কিন্তু সেই আসা ই ত তার শেষ আশা। সফল হইল তাহার সমস্ত সাধনা, ত্যাগ। সত্যেনের স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল বিজলী নিজের গোপন পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতে।

এই তিনটী বারাঙ্গনা চিত্রে শরৎবাবুর আখ্যান-বস্তু কি? শরৎবাবু বিজলীর মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, "সকল দেহেতেই ভগবান বাস করেন এবং তিনি আমরণ দেহটা ছেড়ে যান না।" বারাঙ্গনা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ সমাজ ও সাধারণ মানুষ বারাঙ্গনা নামে আতঙ্কিত হইয়া উঠে, সকল অবস্থায় তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, অপমান করে। শরৎবাবু বলিয়াছেন যে পুরুষ নারীর দেহজ সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও জৈব। 'স্বভাবকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারী দেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে। কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না।' বিজলী নর্ত্তকী তথাপি সে নারী। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "পতিতা" কবিতায় এই কথাই বলিয়াছেন,

"সাধক বিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগর তীরে"।

গৃহ-ত্যাগিনী বিধবা

প্রথমেই মনে পড়ে চরিত্রহীনের সাবিত্রীর কথা।

চরিত্রহীন পুস্তকখানির নামকরণ মধুর। আপাত দৃষ্টিতে সাবিত্রী চরিত্রহীনের অধিক চরিত্রই ভ্রষ্ট। সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, দিবাকর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকেই চরিত্রহীন; অথচ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা দিক আছে যে যাহাতে তাহারা প্রত্যেকেই তথা-কথিত চরিত্রবান অপেক্ষা অধিকতর চরিত্রবান। সাবিত্রী নামটীও মধুর। 'সাবিত্রী' নাম কি শ্লেষ বোধে শরৎবাবু মনোনীত করিয়াছেন! যাক্ পটলডাঙ্গার মেসের যবনিকা উত্তোলন মাত্রই পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হইল সাবিত্রীর।

সাবিত্রী মেসের সর্ব্বময়ী। স্নেহ যত্নে সবাইকে আপন করিয়া লইয়াছে। সতীশও তাহার আপন হইল। অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে একদিনেই সাবিত্রী সতীশকে আপন করিয়া লইল। স্নেহের নিকট শরৎবাবু চিরকালই দুর্ব্বল। এই জন্যই শরৎবাবু নারী চরিত্রে স্নেহের দিকটাই সবিশেষ চিত্রিত করিয়াছেন। সাবিত্রীর নিবাস তাহার পাতান মাসী মোক্ষদার গৃহ। মোক্ষদা বিধু ইত্যাদি ভদ্র নারী নহে। 'দুখানা নোট আঁচলে বাঁধিয়া দিলে তাহারা গেলাস ছোঁয়'। তাহাদের গৃহে সময়ে অসময়ে 'মুড়ী কড়াই ভাজা হাঁসের ডিমের খোসা কাঁকড়া চিবানো চিংড়ী মাছের খোলা ছড়াছড়ি যায়।' অথচ সেই মোক্ষদা-মাসীর গৃহে বাস করিয়া সাবিত্রী মেসে দাসীবৃত্তি করে, নিরামিষ আহার করে, একাদশী পালন করে, 'বিপিনের অর্থ ও বিলাস' প্রস্তাবকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। মোক্ষদা মাসীর কথায় 'ভবিষ্যতের জন্য কোন বন্দোবস্ত করে না।' সুতরাং সাবিত্রীকে সাধারণ পতিতার পর্য্যায় ফেলিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অথচ যে হিন্দু মহিলা পরপুরুষ ভুবন মোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া সমাজের বাইরে অভদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিতেছে তাহাকে পতিতা ভিন্ন অন্য কি বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে? সতীশ কতবার কতভাবে সাবিত্রীকে নিকটে টানিয়াছে, কিন্তু

সাবিত্রী চিরকাল তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। সতীশ একদিন তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে নাই। সতীশ জ্যোতিষবাবুকে সগর্ব্বে বলিয়াছিল, "সাবিত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় আমাকে ছেড়ে চলে না যেতো, আমি যত দিন বাঁচতুম তাকে মাথায় ক'রে রাখতুম।" সরোজিনী ব্যাপারে সাবিত্রীর উদারতা ছিল যথেষ্ট। সাবিত্রী সতীশকে অতিমাত্রায় ভালবাসিয়াছিল, অথচ সে বিশেষ ভাবে জানিত যে 'যথার্থ প্রেম, প্রিয়তমকে শুধু নিকটেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়।' সাবিত্রীর ভোগ-লিপ্সা নাই, অর্থ পিপাসা নাই। সামাজিক দাবী নাই, আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাহার আনন্দ। সাবিত্রী সতীশকে ত্যাগ করিয়া যে ভাবে চেত্‌লায় দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিয়াছে, কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছে, ত্রিশ টাকার জন্য সতীশের নিকট আসিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছে, তাহা সাবিত্রীর একনিষ্ঠ মনের পরিচায়ক। পথভুলে কিংবা আত্মীয় ভুবনমোহনের প্ররোচনায় যদি সে গৃহত্যাগ না করিত, তবে কি সে হিন্দু ঘরের আদর্শ মহিলা হইত না? মনোবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রাজলক্ষ্মীর মত সাবিত্রী কখনো দেহকে পণ্য সাজাইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে নাই। রাজলক্ষ্মীর মত সাবিত্রীর

দান ধ্যান নাই; সাবিত্রীর অভাব-বোধ অতি অল্প—দেহের দিক দিয়াই হউক অথবা মনের দিক দিয়াই হউক। সাবিত্রী তাহার সর্ব্বস্ব নিবেদনের ভিতর দিয়া সতীশকে সমর্পণ করিয়াছিল। সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ দিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বিবাহ দেওয়ার কথা বলিলেও শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়া উঠিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর নিকট শ্রীকান্ত চিরকাল পার্শ্বচর ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছাই প্রায়শঃ জয়ী হইয়াছে। শ্রীকান্ত একান্ত ভাবে Lady's man রাজলক্ষ্মী অভয়া। কমললতা পর পর শ্রীকান্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। অন্য দিকে সতীশ বলিষ্ঠ, সবল পুরুষ; সাবিত্রী পুরুষরূপেই সতীশকে দেখিয়াছে, আশ্রয়-স্থল মনে করিয়াছে। অন্য দিকে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কিরণময়ী ও হারানবাবুর বিবাহিত জীবন অতীব করুণ। স্বামীর ভালবাসা সে কখনও পায় নাই। 'বাড়ীর মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী; একজন দার্শনিক–তিনি স্ত্রীকে প্রাণপণে পড়াইয়া খুসী। আর একজন ঘোর স্বার্থপর পুত্রবধূকে খাটাইয়াই সুখী।' দুইটী বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষ নারীর প্রেমহীন মিলনকে হিন্দু সমাজে বিধির নির্ব্বন্ধ বলিয়া নতশিরে মানিয়া লওয়া

কিরণময়ী

হয়। কিন্তু কিরণময়ী তাহা মানিয়া লইল না। এখানেই কিরণময়ীর ট্রেজেডী আরম্ভ। হারান বাবু স্ত্রীকে ভাবিলেন শিষ্যা, যেমন একদিন 'চন্দ্রশেখর' ভাবিয়াছিল 'শৈবলিনী'কে। কিরণময়ীর মনে অতৃপ্ত বাসনা ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার—স্বামীকে সর্ব্বদেহ মন দিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা। স্বামীর দৃষ্টি যখন বহুদূরে দর্শনের জীর্ণ পত্রে নিবদ্ধ, তখন হয় ত কিরণময়ী ভাবিতেছিল একটী স্নেহের কথা—একটুখানি প্রেমের বিলাস। রুগ্ন শয্যায় স্বামী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, স্ত্রী তখন প্রতীক্ষা করিতেছিল অনঙ্গ ডাক্তারের। তৃষ্ণার্ত্ত কিরণময়ী 'নর্দ্দমার গাঢ় কালো জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে গেল'। অনঙ্গ ডাক্তার সংসারের অর্দ্ধেক খরচের ভার মাথায় লইয়াছিল—সে দায়িত্ব অবশ্য স্বার্থান্ধ শাশুড়ী অঘোরময়ীর। কিন্তু প্রভাতের আলোকে যেমন নিশীথ রাত্রির তারা মিলাইয়া যায়,তেমনি একদিন অকস্মাৎ অনঙ্গ ডাক্তার গেল কিরণময়ীর চিত্র হইতে মিলাইয়া উপেন্দ্রের আগমনে। কিরণ আর নর্দ্দমার কালো জলে তৃপ্ত রহিল না। উপেন্দ্র স্বচ্ছ সলিল; অবগাহন করিয়া কিরণময়ী স্নিগ্ধ হইল; উপেন্দ্রকে ভালবাসিল। সে ভালবাসা তীব্র, অতি তীব্র; বাধা মানে না, শাসন মানে না, সমাজ মানে না, সম্মান মানে না। সর্ব্ব বিষয়ে উপেন্দ্র

ভালবাসিবার পাত্র ছিল বটে। কিন্তু কিরণময়ীর পাত্র নির্ব্বাচন ভুল হইল ঐখানে যে উপেন্দ্রের গৃহে ছিল তাহার একান্ত নির্ভরশীলা স্বামীগতপ্রাণা বিশ্বাসিনী সুরবালা। উপেন্দ্র কিরণময়ীকে প্রশ্রয় দিল না। কিরণ এক দিন সজ্ঞানে উপেন্দ্রের নিকট আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সহৃদয় উপেন্দ্র সদ্যবিধবা অস্থিরা অধীরা কিরণময়ীকে দিবাকরের অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া তাহার ভাব গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে একদিন অঘোরময়ীর ব্যঙ্গোক্তিতে তিক্ত হইয়া কিরণময়ীর উপর ঘৃণায় তাহাকে মুখের উপর অপমান করিল; তাহার প্রদত্ত অন্ন প্রত্যাখান করিল। দিবাকরকে কিরণময়ীর সংসর্গ ত্যাগ করিতে আদেশ করিল। তাহাকে 'ভাইপার' নাস্তিক অপবিত্র বলিয়া তিরস্কার করিল। কিরণময়ী ক্রোধে আত্মহারা হইল। শরৎ-বাবুর মতে কিরণময়ী-দিবাকর নাটকের এই ঘটনা হইল প্রত্যক্ষ প্রচ্ছদপট। এইক্ষণ হইতে দিবাকরকে আবর্ত্তন করিয়া চলিল কিরণময়ীর প্রতিশোধের প্রচেষ্টা। কিরণময়ীর সৌন্দর্য্য মেধা বুদ্ধি প্রেম অতি উগ্র। ভাল করিবার, মন্দ করিবার শক্তি তাহার মাত্রাহীন। যে দিন প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হইল সেদিন কিরণ পাত্রাপাত্র বিচার

করে নাই, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। পর্ব্বত গাত্র হইতে নিঃসৃত বহুকাল স্তব্ধ নির্ঝরিণী ধারার মত অপরিমেয় বেগে সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, তাহাই সবেগে ভাসাইয়া চলিয়াছে কিরণময়ীর প্রেম, অথবা প্রতিহিংসা অথবা জিগীষা। কিরণময়ী দিবাকরকে আকৃষ্ট করিল যেমন আকর্ষণ করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অসংন্দিগ্ধ প্রজাপতিকে। শরৎবাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কিরণময়ী নিজেকে অপমান করিয়াও দিবাকরের ভিতর দিয়া উপেন্দ্রকে শাস্তি দিল। অবশ্য নিজেও তার জন্য কম শাস্তি গ্রহণ করে নাই। আরাকানে বাড়ীওয়ালা তাহাকে 'বারবনিতা' আখ্যা দিল। 'বেবুশ্যে' বলিয়া শ্লেষ করিল। জাহাজে দিবাকরের সঙ্গে অত্যন্ত আশোভন ব্যবহার ও অশ্লীল আলাপ সত্তেও শরৎবাবুর কিরণময়ী আত্মসংযমী। শরৎবাবুর মতে আপাত দৃষ্টিতে দেহ সর্ব্বস্ব হওয়া সত্তেও কিরণময়ী দিবাকরের সঙ্গে একত্রবাস করিয়াও তাহার দেহ নষ্ট করে নাই—নিজেকে দিবাকরের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং শরৎবাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কিরণময়ীর মনোধারার গতি নির্দ্দেশ দেহজ নহে। তাহা মস্তিষ্কজ, বিকৃত মনের প্রতিকূল প্রক্রিয়া। কিরণময়ী দিবাকরকে স্পষ্ট বলিয়াছিল,

'অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে, তখন তোমার উপেন্‌দাদার ঘাড়েও উঁচু'করে রাখ্‌বার মত মাথা কিছুতেই রাখবো না'। আরাকানে কিরণময়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া দিবাকর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ্‌লে কি আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যই এ বিপদ টেনে এনেছিল। কোনদিন কি ভালবাসোনি' ? কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "না; তোমার নয়, আর এক জনের সর্ব্বনাশ কর্‌চি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেছি।" কিরণময়ী পরিশেষে স্বীকার করিল যে 'তাহার আগাগোড়াই ভুল হ'য়ে গেছে।'

আমরাও বল্‌তে পারি কিরণময়ীর চরিত্র অঙ্কণে শরৎবাবুর 'আগা'তে ভুল না হইলেও 'গোড়া'তে ভুল হইয়াছে। কিরণময়ীর চরিত্রের মূল-বস্তু কি ? তাহাকে দেখিলাম হারাণবাবুর পত্নী, অনঙ্গ ডাক্তারের অভিসারিকা, উপেন্দ্রের প্রেমিকা, দিবাকরের মোহিনী, পরিশেষে গঙ্গাতীরে পাগলিনী। চরিত্রহীনের প্রথমাংশে কিরণময়ী দেহসর্ব্বস্ব উদ্দাম প্রমত্ত চতুর যুবতী। হারাণবাবুকে বিবাহ করিয়াছে, অনঙ্গ ডাক্তারকে মজাইয়াছে, উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে, দিবাকরকে ডুবাইয়াছে। কিরণময়ীর ভিতর আদর্শ-জ্ঞান ছিল, তাই একদিনে অনঙ্গ ডাক্তারকে জীবন চিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন

করিয়া ফেলিতে পরিয়াছিল। সতীশ ও উপেন্দ্র একই নিশীথে হারাণবাবুর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে তাহার জীর্ণ ভগ্ন গৃহে কিরণময়ীর দৃষ্টি পথে আসিয়াছিল। সতীশের সুন্দর রূপ, নিটোল স্বাস্থ্য, এবং যুবজনোচিত বিলাস সজ্জা কিরণময়ীকে মুগ্ধ করে নাই। কারণ কয়েক দিন হইতে কিরণ শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট উপেন্দ্রের পরোপচিকীর্ষার বিষয় শুনিয়া শুনিয়া উপেন্দ্রের বিষয় একটা উচ্চ ধারণা করিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথম পরিচয়ের রাত্রে সতীশের বাঙ্গোক্তিগুলি রুচিসম্মত ছিল না। সুতরাং উপেন্দ্রই কিরণময়ীকে বেশী আকৃষ্ট করিল। বোধহয় তখনও স্বামীর চিতাভস্মের উষ্ণতা ছিল, অথচ সদ্য বিধবা কিরণময়ী উপেন্দ্রের নিকট নিঃসঙ্কোচে প্রেম নিবেদন করিল। কয়েক দিন পরেই আবার দিবাকরকে দিতেছিল রতি শাস্ত্রের পাঠ। এই দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য কোথায়? শরৎবাবু দিবাকর-কিরণময়ী নাটকের একটা প্রচ্ছদ-পট প্রস্তুত করিলেন—উপেন্দ্রের প্রত্যাখান ও অপমান এবং কিরণময়ীর প্রতিহিংসা স্পৃহা। শরৎবাবুর মতে কিরণময়ী মনস্তত্ত্বের কেন্দ্র-মূল হইল উপেন্দ্র। শরৎবাবু প্রতিশোধ স্পৃহাকে কিরণময়ীর জীবনে বিশেষ স্থান দান করিয়া কিরণময়ীর কার্য্যকলাপকে যুক্তি সঙ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু

জিজ্ঞাস্য এই যে কিরণময়ীর প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিল কোন দিন হইতে এবং কোন দিক্ হইতে? ঘটনা ব্যপদেশে দেখা যায় যে শাশুড়ী অঘোরময়ী উপেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দরজায় করাঘাত করিতেছিল—ঠিক সেই সময়ে কিরণময়ী দিবাকরের নিকট বর্ণনা করিতেছিল—নারীর রূপ কাহাকে বলে? নারীত্ব কি? ভালবাসা কাহাকে বলে? সদাবিধবা হিন্দুনারী বয়ঃকনিষ্ঠ বিদ্যার্থী দেবরের নিকট কি নারী-তন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অঘোরময়ী তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"হলোই বা দেওর, বউ মানুষের সোমত্ত বয়সের ছেলের কাছে............." ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য এই ইঙ্গিত ভদ্রোচিত নয়। এই তিরস্কারের মধ্যে মাত্রাধিক্য ছিল। তখনই প্রতিশোধ মনস্তত্ত্বের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিরণময়ী দিবাকরকে বুঝাইতেছিল—সন্তানধারণের যে 'সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী—তাই নারীর রূপ'; ইহার পশ্চাতে কি দিবাকরের মনে নারীদেহের প্রতি লোভ জন্মাইবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ছিল না? আরও বহু অবান্তর কথা বলিয়া, চিবুক স্পর্শ করিয়া কিরণময়ী দিবাকরকে কোন পথে টানিতেছিল? শরৎবাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে দিবাকরের প্রতি তাহার বাস্তবিক কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রগল্‌ভা নারী কথায় কথায়

শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল মাত্র। এই যুক্তি দ্বারা কিরণময়ীকে সমর্থন করার চেষ্টা এবং শিশুকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হস্ত স্থাপন করিয়া অগ্নির দাহিকা-শক্তি পরীক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করা একই কথা। শরৎবাবুর মতে উপেন্দ্রের প্রতি হিংস্র প্রতিশোধ লইবার বাসনাপ্ররোচিত হইয়াই কিরণময়ী দিবাকরের প্রতি এই অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে। কারণ উপেন্দ্র তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে নিষেধ করিয়াছিল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কিরণময়ী বলিল, 'বিধবার কাছে সেও যা তুমি ও তা'। কি গ্লানিকর কথা! উপেন্দ্র বলিয়াছিল, "আপনাকে চিনি, কিন্তু কথাটা জেনে রাখুন যে ভালো আপনি কাউকে বাস্‌তে পারবেন না। সে সাধ্য নেই আপনার, শুধ্ সর্ব্বনাশ কর্ত্তেই পারবেন"।

প্রতিশোধ স্পৃহা এখান হইতে আরম্ভ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে ত কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতার ঋণ কি দিবাকরের নিকট নারী-রূপ বিশ্লেষণ করিয়া শোধ করিল? এই দিবাকরের সঙ্গে প্রেমচর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্যবিহীন কাব্য রসাস্বাদন? অথবা Platonic discussions? মোটের উপর কিরণময়ীর চরিত্রে পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নাই। শরৎচন্দ্র সমস্ত যুক্তি সত্ত্বেও কিরণময়ীর চরিত্র অঙ্কণে সফলকাম হইয়াছেন কি না সন্দেহ।

শেষ পরিচয়ের সারদার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয় হাঁসপাতালে মৃত্যু শয্যায়। বিধবা সারদা জীবনবাবুর সঙ্গে সারদা গৃহত্যাগ করিয়াছে। সারদা পদস্খলিতা। জীবন বাবু নুতন কমললত জীবনের সন্ধানে চলিয়া গেল। সারদা পড়িয়া রহিল সবিতার পার্শ্বে। সবিতা স্বামী বর্ত্তমানে গৃহ ত্যাগিনী। দুই জনই দুই জনকে জানে। দুই জনেই জীবনে বিতৃষ্ণ। অথচ সবিতার প্রতি সারদার কি অসীম শ্রদ্ধা! রাখাল হাঁসপাতালে সারদাব প্রাণরক্ষা করিয়াছে। রাখালকে দেবতার স্থানে বসাইয়া সারদা নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়াছে। সারদার চরিত্রে কমললতার মতন ঠাকুর সেবায় আত্মোৎসর্গ নাই। মানুষের সেবায় সারদার আনন্দ—সেবার বস্তু রাখাল সবিতা বেণু ব্রজবাবু কিংবা আর যে কেহই হউক। কমললতা সততই প্রায়শ্চিত্ত করিতে উন্মুখ। নিজের অতীতের স্মৃতিতে সে শিহরিয়া উঠে। সারদার প্রায়শ্চিত্ত দয়িতকে শ্রদ্ধা নিবেদন। কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছে; সারদা রাখালকে ভাল বাসিয়াছে। কমললতার সঙ্গে শ্রীকান্তর যোগসূত্র ছিল নাম সামঞ্জস্য—কমললতার প্রথম স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত। রাখালের প্রতি সারদার আকর্ষণ ছিল কৃতজ্ঞতা। শ্রীকান্ত

কমললতার কোন উপকার করে নাই। তাহাদের সম্বন্ধ প্রীতির। রাখালের সহিত সারদার সম্পর্ক করুণার।

কমললতা

কমললতা শ্রীকান্তের জীবনে রাত্রি শেষের সুখ স্বপ্নের মত কয়েক দিনের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিল—বড় করুণ, আবেশময়, স্নিগ্ধ-জীবন। পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। পিতা কণ্ঠী বদল করিয়া বিধবা সন্তানবতী কন্যা উষার সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাধান করিতে পারিলেন কি? উষা এবার হইল বৈষ্ণবী কমললতা। সেবায় সাধনায় কর্ম্ম-কুশলতায় এবং সঙ্গীতে কমললতা মুরারিপুর আশ্রমকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। ঠাকুরের পায়ে আত্ম-নিবেদন করিয়া তাহার যৌবনের মোহময় দিনগুলি কাটাইয়া দিল। পুরাতনকে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিল নুতনের আবরণে; রাজলক্ষ্মীও তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছিল গুরুসেবা ও মন্ত্র-জপের ভিতর দিয়া। কিন্তু কমললতার সব বিস্মৃতি ভাসিয়া গেল যে মুহূর্ত্তে আসিল শ্রীকান্ত পুরাতনের স্মৃতি লইয়া মুরারিপুর আশ্রমে। একদিনেই কমললতা শ্রীকান্তের নিকট অকপটে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে যেন প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীকান্ত বিব্রত হইল।

কমললতা শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ভাব্‌বে এমন মানুষ ত দেখিনি, এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়"। শ্রীকান্ত স্পষ্ট ভাবে ইহার উত্তর দিতে পারে নাই; কমললতা নিজেই উত্তর দিল, "শুধু নাম শুনেই মেয়ে মানুষ পাগল হয়, গোঁসাই, এ সত্যি"। কমললতা যে বৈষ্ণব আবেষ্টনীর বিলোলপরিস্থিতির মধ্যে তাহার আবেশময় দিনগুলি কাটাইতেছিল—যেখানে নাম কীর্ত্তনই ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের একমাত্র পন্থা, সেখানে কমললতার হৃদয়ে যদি তাহার বহুদিন বিস্মৃত প্রিয়নাম শ্রবণে, নাম সামঞ্জস্য এবং নামোচ্চারণে পুরাতন স্বামীর স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? কমললতা ভাবিয়াছিল—"পূর্ব্বজন্ম সত্যি, না হ'লে এমন অসম্ভব বস্তু কি কখনো এক দিনের মধ্যে ঘট্‌তে পারে?" কেহ কেহ কমললতাকে বলিবেন Flirt—'ফ্লার্ট' হয়ত বা তা ই। কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর-সেবার সখ্য, কান্ত, দাস্য ভাবের মধ্যে কমললতার চরিত্রের রসরেখার প্রচ্ছদ পট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? শ্রীকান্তও প্রথমে ঐ রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা করিতেছিল। কিন্তু তারপর দেখিল কমললতার মধ্যে দেহের আবিলতা নাই। প্রিয়নাম শ্রবণে কমললতার মন অমন একটা বিদেহ মাধুর্য্য রসে ভরিয়া গিয়াছিল যে সে তাহার মধ্যে আর অন্য কোন

রসের স্থান রহিল না। রাজলক্ষ্মী কমললতার কথোপকথনের ভিতর দিয়া শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রীতির ধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। শ্রীকান্তের স্পর্শ কমললতার জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়া দিয়াছিল; সেই পাথেয় মাত্র সম্বল করিয়া কমললতা চলিল বৃন্দাবনে—সেই প্রেমের রাজ্যে যেখানে দেহাতিরিক্ত নিবেদনের ভিতর দিয়া দয়িতকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বৈষ্ণবী কমললতার বৃন্দাবন যাত্রার মধ্যে স্থান কাল পাত্রের সুসঙ্গতি আছে।

শেষ প্রশ্নের কমলও বিধবা। তাহার রক্তে হিন্দু ও কমল খৃষ্টানের মিশ্রণ। * (৭) তাহার সংস্কৃতি অধিকতর পাশ্চাত্য যদিও জন্মভূমি এবং শিক্ষাভূমি ভারতবর্ষ। যন্ত্র সভ্যতার আবেষ্টনী যেখানে সমস্ত অতীত মুছিয়া গিয়াছে, দৈবে দাবীর চিহ্ন মাত্র বিলুপ্ত, সংস্কারের কোন সত্তাই নাই; মানুষ যেখানে একমাত্র আত্মশক্তিতে আস্থাবান, মস্তিষ্ক দিয়া সব জিনিষ বিশ্বাস করে। বিনা যুক্তিতে কোন জিনিষ গ্রহণ

---

(৭) * কেহ কেহ বলেন 'কমল' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নারী সংস্করণ। অন্যান্য কেহ বলেন 'পথের দাবী'র 'ভারতী'র নব সংস্করণ। উভয়ই অযথার্থ বর্ণনা।

করে না সেই যন্ত্র সভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে **কমল** পরিবর্দ্ধিত। **কমলের** দুইটী রূপ:— হিন্দু বিধবার মত কমল নিরামিষ আহার করে, এক আহারী, খাদ্যে বস্ত্রে সংযমশীলা। অথচ সেই কমলই আবার হরেন্দ্র রাজেন্দ্রের আশ্রম শিশুদের আত্ম-নিগ্রহে জ্বলিয়া উঠে। যাহা কিছু ভারতের অতীত তাহার বিরুদ্ধে উষ্মা যেন কমলের জীবনের ভিত্তি। কারণে অকারণে হিন্দু সমাজকে আঘাত করার জন্য

ভিত্তি। কারণে অকারণে হিন্দু সমাজকে আঘাত করার জন্য

অভিমান; এই দুইটী ধারায় কমলের চরিত্র প্রবাহিত হইয়াছে। কমল মনে করিত সে সংস্কার বিবর্জ্জিতা। তাজমহল সন্দর্শনে গিয়া কমল প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। আরম্ভেই কমল হিন্দুনারীর সংস্কারের মূল কথায় আঘাত করিল। নিষ্ঠা হইল হিন্দুনারীর বিবাহিত জীবনের ভিত্তি। 'তাজমহলকে একনিষ্ঠ প্রেমের অক্ষয় নিদর্শন' বলিয়া কমল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিল না, বরঞ্চ তাজমহলকে 'বাদশাহের স্বকীয় আনন্দলোকের অক্ষয় দান' বলিয়া একদিকে পরোক্ষ ব্যঙ্গ করিল, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ স্তুতি করিল। তাজমহলের প্রতি এই দৃষ্টি-ভঙ্গিমা অবশ্য নুতন নহে, রবীন্দ্রনাথও সম্রাট্ শাহ্জাহানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন :—'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি সুমহান।' কমল আর একটা কথা বলিল, 'যাকে একদিন ভালবেসেছি, কোন কারণেই আর পরিবর্ত্তন হবার যোই নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" কমল হিন্দুনারীর নিষ্ঠার মূলে আঘাত করিল। মনোরমা সহিতে পারিল না। তবু অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে কমল বলিল, "মানুষের পক্ষে যে মরে গেছে, তার স্মৃতিকে ভালবেসে নিজের দেহমনকে বুভুক্ষিত রাখায় মধ্যে সার্থকতা কোথায়"? আশুবাবুকে বলিল, "যে মরে গেছে, তাকে

দেবারও কিছু নেই, তাকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই, ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে। আছে কেবল একদিন যে তাকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনা মনে ; মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন ক'রে, বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতকে ধ্রুব-জ্ঞানে জীবন যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।" কমল বলিতে চায় যে বৈধব্যের মধ্যে নারীর মৃত্যু প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়। 'মানুষ মরে কিন্তু যে বেঁচে থাকে তার ভেতরের ভালবাসা কি মরে'? হিন্দু-সমাজ বিধবার সম্মুখে সংস্কারের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বলে, 'এই পর্য্যন্ত, এর পর আর নয়'। সমাজের শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিধবার নারীত্বকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। বিধবা নারী বুঝিতেও পারে না যে সে প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতেছে। কমলের বক্তব্য হইল যে একজন একাধিক মানুষকে সমভাবে ভালবাসিতে পারে। তাহাতে প্রথমতম প্রিয়তমের প্রতি অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। যে মানুষ অতীতের লোভে বর্ত্তমানকে ভুলিয়া যায়, সে ত স্থবির। কমল প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচিতে চায়। কমল ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদী। তার কাছে অতীত যেমন একদা

সত্য ছিল, বর্ত্তমানও তেমন সত্য। * (৮)

কমলের বিবাহের ইতিহাস একটু রহস্যজনক। শরৎবাবু কমলের প্রথম বিবাহের কোন বিশেষ সংবাদ দেন নাই। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর কমল শিবনাথকে স্বামী ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'শিবনাথ' 'শিবানী' নামকরণ মধুর। শিবনাথ শিবানীর শৈব বিবাহের মধ্যে অনুপ্রাসের রস আছে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া কমল শিবনাথকে পায় নাই, অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিবনাথকে বাঁধিয়া রাখিতে চায় না। কমল অতি সহজে শিবনাথকে গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি সহজেই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে এবং করিয়াছেও। ইয়াঙ্কী কুমারীদের মত trial marriage এর পৃষ্টপোষকতা কমল করে নাই বটে, কিন্তু আচারে ব্যবহারে, কথা বার্ত্তায় ও কার্য্য কলাপে কমল প্রায় trial marriageএর অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। মনোরমা যে শিবনাথকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহা কমলের মতন তীক্ষ্ণদৃষ্টিময়ির দৃষ্টি অতিক্রম

(৮) * এই আলোচনা দ্বারা শরৎবাবু কমলকে সংস্কার বিহীনা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু কমল কেন যে বৈধব্যের এক-আহার ও নিরামিষ আহারের সংস্কার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

করিয়া যায় নাই, কিন্তু কমল দুঃখিত হইয়াও দুঃখিত হয় নাই। শিবনাথের শিথিলতা অপেক্ষা নীচতাই কমলকে অধিকতর ব্যথিত করিয়াছিল। অবশ্য কমল অজিতের প্রতি আকৃষ্ট না হইলে শিবনাথ-মনোরমার প্রাতিকে কি ভাবে গ্রহণ করিত, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। কমল অজিতকে আকর্ষণ করিয়াছিল, নিজেও অজিতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—ইহা যথার্থ। বিচার্য্য এই যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বস্তু কি ছিল? পূর্ব্বরাগ কাহার? পূর্ব্বরাগ বোধ হয় কমলেরই। কিন্তু অত্যন্ত চতুর কমল অজিতকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুরাগের স্পষ্ট অভাস দেয় নাই। কমল Siren এর মতন ক্রমশঃ অজিতকে আকৃষ্ট করিতেছিল। তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহার মোহময়ী আলাপ আলোচনা দ্বারা অসন্দিগ্ধ অজিতের উপর মোহ জাল বিস্তার করিতেছিল। কমলের সুন্দর নারী দেহের আকর্ষণ অজিতের মধ্যে প্রত্যক্ষ্য ভাবে কাজ করে নাই। বাক্-গৃহিতা মনোরমার শৈথিল্য পরোক্ষ ভাবে অজিত-মনোরমার বাক্য-বন্ধন শিথিল করিয়াছিল। মনের দিক দিয়া মনোরমার সমস্ত ব্যাপারই নেপথ্যে। কিন্তু অজিতের প্রতি কমলের আকর্ষণ-বস্তু কি ছিল? অজিতের পুরুষোচিত স্বাস্থ্য, অজিতের

ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, মোটর অভিযানের উচ্ছল উল্লাস, শিবনাথের চরিত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা, নূতনের মোহ অথবা হিন্দু সমাজকে আঘাতের চেষ্টা ? ইহার মধ্যে যে কোন একটী অথবা অনেকটী।

শরৎবাবু বিধবাদের অথবা স্বামীত্যাগিনিদের কোথায়ও বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর নারীদেব মনোবিশ্লেষণে শরৎবাবু ইউরোপীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টান অথবা মুস্‌লিম সমাজে স্বামীত্যাগিনিদের অন্য স্বামী গ্রহণ কিংবা বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা বহু সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজ ব্যাপক ভাবে এই সমাধান গ্রহণ করে না। শরৎবাবু কোন গ্রন্থেই বিধবা বিবাহ দিতে পারেন নাই কিংবা পতিতার জন্য স্বামীর সন্ধান দিতে পারেন নাই। সতীশ যখন সাবিত্রীকে অনুরোধ করিল, "কেউ যদি আমাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমার স্বামীত্ব স্বীকার করবে, বলো ?" সাবিত্রী ইহার প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, দিতে পারে নাই। তথা শরৎবাবুও দিতে পারেন নাই। শরৎবাবু শেষ পর্য্যন্ত কমললতাকে বৈষ্ণবী করিয়াছেন, কিরণময়ীকে পাগল করিয়াছেন, সারদাকে ধাত্রী শিক্ষা দিলেন, রমাকে কাশী

পাঠাইয়া দিলেন। অপরিসীম দরদ সত্ত্বেও শরৎবাবু তাহাদিগকে সমাজে স্থান দেন নাই। অজিত-কমল ব্যাপারেও শরৎবাবু তাহাদিগকে সমাজের গণ্ডীর ভিতর আনিয়া বিবাহ দেন নাই; তাহারা মোটর চাপিয়া বহু দূরে নূতন সংসার স্থাপনের জন্য চলিয়া গেল। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহার 'অসমাপিকা' গ্রন্থে পুরুষ-নারীর সমাজ বহির্ভূত মিলনের অসমাপ্তি দেখাইয়াছেন; এমন কি অন্য সমাজে গিয়া মিসেস ব্যালাকিয়ানের গৃহে বাস করিয়াও 'সুচারু' এবং 'সুরুচি' তৃপ্ত হইতে পারিল না। শরৎবাবুও অজিত-কমলের উপাখ্যানের অন্তরালে বিবাহ অনুষ্ঠান বাদ দিয়া পুরুষ নারীর মিলন ঘটাইয়া সমাজের বাহিরে সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অজিত-কমল মিলনের শেষ ফল যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া গেল।

এখানে আমাদের জিজ্ঞাসা—'শেষ প্রশ্নে'র প্রশ্ন কি? আর শরৎবাবু তাহার উত্তরই বা কি দিয়াছেন? কমল কি চায়? যাহা চায় তাহা পাইয়াছে কি? 'শেষ-প্রশ্নে'র নারী চরিত্র গুলিতে কাহারো কি কোন বিশেষ প্রশ্ন আছে?

কমল একাধিকবার বিবাহিতা; মনোরমা বাগদত্তা; নীলিমা বিধবা; বেলা স্বামী-ভর্তৃকা ছিন্ন-বন্ধনা। কমল শাহজাহানের প্রেমকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে; 'তাজের' স্মৃতিকে

হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে ; আশুবাবুর স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার আয়োজনকে দুর্ব্বল স্থবির মনের বিকৃতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নিজের জীবনে কমল কেন্দ্রহীন বৃত্ত। কমলের চরিত্র মানুষকে চমকাইয়া দেয় ; কমল কথার ফানুস্। তার চরিত্র বিচিত্র, কিন্তু নূতন নহে। অজিত মনোরমার বিবাহ বহুকাল স্থির। বাক্‌দত্তা মনোরমা অজিতের নিকট অমন ভাবে আত্ম সমর্পন করিয়াছিল যে তাহার বহুদূরাগত ইচ্ছামাত্রই মনোরমার বিলাসবর্দ্ধিত জীবনকে ভোগ নিস্পৃহ করিয়াছিল। তারপর হঠাৎ মনোরমার শিবনাথের সহিত পিতৃ-গৃহ ত্যাগ যুগ বিপ্লবী ঘটনা নহে। পিতার অনিচ্ছা, সমাজের অখ্যাতি, অজিতের অ-প্রীতি সবই শিবনাথের সঙ্গীতের সুরে ভাসিয়া গিয়াছে। বাক্‌দত্তা নারীর অন্য পুরুষ গ্রহণ সমাজের পক্ষে দুঃখের ও ক্ষোভের ব্যাপার বটে ; কিন্তু তাহা নূতন নহে। নীলিমা বিধবা, কোনো নূতন সমস্যা নহে ; সে অন্য-পুরুষকে—হউক না সে বাতে পঙ্গু বৃদ্ধ আশুবাবু—ভালবাসিয়াছে,—তাহাতে আর নূতন কি আছে ? বিধবা নারীর ভালবাসার কেন্দ্র প্রয়োজন। সে ভালবাসা সময় বিশেষে পাত্র নিরপেক্ষ। অবস্থার সুযোগে আশুবাবুকে বাদ দিয়া হরেন্দ্রকেও নীলিমা ভালবাসিতে পারিত। বেলার চরিত্র অবতারণার

মূলে কি আছে ? দুশ্চরিত্র স্বামীকে সুচরিতা স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে কি না ? আশুবাবু বলিলেন, 'পারে'। স্বামী যেমন স্ত্রীর নিষ্ঠা দাবী করিতে পারে, স্ত্রীও তেমন স্বামীর নিষ্ঠা দাবী করিতে পারে—নিষ্ঠা উভয়তঃ। কিন্তু শরৎবাবু শেষ পর্য্যন্ত বেলার দাম্পত্য মিলন ঘটাইয়া দিলেন। বেলার চরিত্র সৃষ্টি 'শেষ প্রশ্ন' পুস্তকে বাহুল্য—অযথা সৃষ্টি। বেলার চরিত্র সৃষ্টি—না হইলে আখ্যান-বস্তুর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না।

আমাদের মনে হয় 'শেষ-প্রশ্নে' নারী সমস্যা গৌণ। মুখ্য প্রশ্ন—অনাগত ভবিষ্যতে ভারতের সংস্কার বর্জ্জিত সমাজ কি ভাবে গঠিত হইবে ? 'শেষ প্রশ্নে'র কমল কি ভারতের সেই অনাগত ভবিষ্যৎ সমাজের অগ্রদূত ? যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একটা নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টা চলিতেছিল, বিশেষ করিয়া রুশিয়ায়। সেই ধ্বংসযুগের সাহিত্য শরৎবাবু পাঠ করিয়াছেন। শরৎবাবু জীবনের শেষাংশে সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই যুগেরই লেখা তাঁহার 'পথের-দাবী', 'নব-বিধান', 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষ পরিচয়', 'স্বদেশ ও সাহিত্য'। তিনি নূতন সমাজ গঠনের পূর্ব্বাভাস রূপে কল্পনা করিয়াছেন কমলকে—ধ্বংস বাণী শুনাইবার জন্য। কিন্তু শরৎবাবু কখনো

পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের সুযোগ পান নাই। যে সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন তিনি কমলের মুখ দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার উত্তর আশুবাবু, অক্ষয় ও হরেন্দ্রের মুখ দিয়া প্রকাশ করাইয়াছেন; সেই উত্তর গুলিও শরৎবাবু প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টি করাইয়াছেন। ঐ সব প্রশ্নের আরও যুক্তি-পূর্ণ উত্তর ছিল। অসুবিধা বোধে শরৎবাবু সে সব উত্তর উল্লেখ করেন নাই। শরৎবাবু ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিশেষ আসেন নাই। পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই, কমলকে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করান নাই। সুতরাং ইহাদের কেহই পাশ্চাত্য সমাজের জন্ম, পরিবৃদ্ধি ও পরিণতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আয়ত্ব করে নাই; কেবল মাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া কল্পনা বলে কোন বিদেশীয় বিজাতীয় সমাজের অন্তরাত্মার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। শরৎবাবু তাহার অর্দ্ধ পক্ক অথবা স্বল্প পক্ক ধারণা গুলি জোর করিয়া কমলের মুখে চাপাইয়াছেন। সুতরাং মত প্রবর্ত্তনের দিক দিয়া শরৎবাবুর **'শেষ-প্রশ্ন'** অসম্পূর্ণ, চরিত্র অঙ্কনের দিক দিয়া কমলও অসম্পূর্ণ। * (৫)

(৫) প্রশ্ন হইতে পারে চরিত্র কাহাকে বলে; ধাতুগত অর্থে

*(৫)চরিত্র শব্দের তাৎপর্য্য—'চরতি অনেন ইতি চরিত্রম্'—যাহা দ্বারা মানব পৃথিবীতে বিচরণ করে ও জীবন যাপন করে। জীবন প্রকাশের তিনটী ধারা—মন, বুদ্ধি ও দেহ। মনের রাজ্যে ভাব প্রবণতার খেলা, চিত্তবৃত্তির খেলা ; মানব বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে, আদর্শ নিরূপণ করে ; এবং দেহ দ্বারা তাহা প্রকাশ করে। কোনো' কোনো' চরিত্রে এই তিনটী ধারা সহযোগে কাজ করে। কাহারো কাহারো জীবনে বিশেষ কোনো' ধারার বিশেষ প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। সাগর সঙ্গমের জল-ধারাকে যেমন বিশ্লেষণ করিলেও কোন নদীর জল নিরূপণ করা যায় না, তেমনি সব সময়ে নারী-বিশ্লেষণ করিয়াও চরিত্রের মৌলিক ভিত্তির সূক্ষ্ম সন্ধান পাওয়া যায় না। কমলকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মন বুদ্ধি ও দেহের স্বরূপ কি পাওয়া যায়? কমলের মনের ভিতর কি ছিল? ভাব প্রবণতা ও চিত্তবৃত্তির অনুশাসন নারী মনের বিশেষ ধর্ম্ম। কমলের মনের ভিতর ভাব প্রবণতা ও চিত্তবৃত্তির কোন বিশেষ প্রকাশ নাই। বুদ্ধির দ্বারা সে কি বিচার করিয়াছে? তাহার আদর্শ কি? তাহার মস্তিষ্কের ভিতর তীক্ষ্ণবৃত্তি ও তর্কশক্তি আছে। তর্কের উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় ; তাহা না হইলে তর্ক বিতণ্ডায় পরিণত হয়। কমল বিতণ্ডাবাদিনী। স্পষ্টবাদিতার অর্থ এই নয় যে প্রতিপক্ষকে অযথা আঘাত করিয়া বিজয়ের গর্ব্বে আত্মশ্লাঘায় তৃপ্ত হইবে। কমলের তর্কের ভিতর হইতে কি আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়? সে হরেন্দ্রের আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; আশুবাবুকে অপ্রতিভ করিয়াছে; অবিনাশ, অক্ষয়,ও

*(৫)সতীশকে হীন করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত,—তারপর? দেহ দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে কি? কমল সব সময় দেখাইতে চাহিয়াছে যে বৈদেহী, তার ভিতর দেহ যন্ত্রের অগ্নি যেন নির্ব্বাপিত। সত্যই কি তাই? কমলের প্রথম স্বামীর কোন উল্লেখ নাই। শিবনাথ শিবানীরই উপযুক্ত স্বামী; কেহই চিত্তবৃত্তির কোন ধার ধারে নাই। অজিতের সঙ্গে যেন "রাজলক্ষ্মী" ভাব, গৃহিনীসুলভ Matronly ভাব; গোপন আকর্ষণও আছে, মধুর বেশও আছে। অজিতকে একহাতে টানিয়াছে, অন্য হাতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। রাজেন্দ্রের সঙ্গে কমল একটু রসসৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 'তুমি' সম্বোধনে তাহাকে অন্তরঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল। রাজেন্দ্রকে বলিল,— "তোমাকে আমার বন্ধু হ'তে হবে।" রাজেন্দ্র সে বান্ধবতা প্রত্যাখ্যান করিল। শরৎবাবু বলিয়াছেন যে কমল চিরকাল মনে করিত সে 'পুরুষের কামনার ধন'। সুতরাং চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় কমলের মধ্যে তাহার কোন দিক সার্থক হইয়াছে?

মত প্রবর্ত্তনের দিক দিয়া শরৎবাবু কি বলিতে চান? তাহার স্পষ্ট আভাস কোথায়? শরৎচন্দ্রের সমালোচক বলিতে পারেন যে কমলের মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র পূতিগন্ধময় বৃদ্ধ জীর্ণ হিন্দু সমাজের দোষ গুলি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সাহিত্যিক বিশ্লেষক, চিকিৎসক নন। শরৎচন্দ্র রোগ বীজাণু নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা সমাজের গোচর করিয়াছেন। রোগ নির্ণীত হইয়াছে, সমাজ সংস্কারক আসিবেন— তাঁহার শাণিত বিধান হস্তে। সংস্কার শরৎবাবুর সাহিত্য সীমার

শরৎ সাহিত্যে বিধবা একটী বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাবিত্রী, কমল, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, কমললতা, শরৎ নীলিমা, সারদা, রমা, বড়দিদি সকলেই বিধবা। রাজলক্ষ্মী সাহিত্যে শৈশবের ক্রীড়া ছলে একদিন শ্রীকান্তকে বরণ করিয়াছিল; বিধবা তাহা সে আমরণ স্মরণ রাখিয়াছে। শ্রীকান্ত তাহার শৈশবের খেলার সাথী; যৌবনের অভিসার, প্রৌঢ়ত্বে ধর্ম্মালোচনার রাজলক্ষ্মী নিরপেক্ষ দর্শক; অবস্থা বিপর্য্যয়ে রাজলক্ষ্মীর ঘটনাবহুল জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্ত জড়াইয়া রহিয়াছে। 'শেষ-প্রশ্নে'র

*(৫)বাহিরে; শরৎচন্দ্রের বুদ্ধি বিশ্লেষণাত্মিকা, পরিপূরিকা নহে। এই যুক্তি দ্বারা শরৎবাবুর 'শেষ প্রশ্নে'র দোষ স্খালন হয় না;— কারণ শরৎচন্দ্র 'শেষ-প্রশ্নে' শুধু বিশ্লেষণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, তিনি পরিপূরণের কাজও করিয়াছেন। হরেন্দ্রের আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, অজিত-কমলের বিবাহ-বিহীন মিলন ঘটাইয়াছেন, মনোরমা-শিবনাথের বিবাহে পিতা আশুবাবুর আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কারকের পদও গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে শরৎচন্দ্র সমাজকে মানিয়া লইয়াছেন, শেষ অধ্যায়ে তিনি নূতন সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপনের আভাস দিয়াছেন, সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। কমল শরৎবাবুর একটী সাময়িক মত; তদানীন্তন মানস-ভবিষ্যৎ। সে কোন বাস্তব চরিত্র নহে।

নীলিমা বর্ষীয়সী বিধবা। বিপত্নীক ভগ্নীপতির দ্বিতীয় দৃষ্টির
নীলিমা আঘাত হইতে সে বাঁচিয়া গেল আশু বাবুর গৃহে তাঁহার সেবা
করিতে আসিয়া। কিন্তু সেবা ব্যপদেশে মৃতদার উদার
আশুবাবুর অকর্ম্মণ্য বাতপঙ্গ দেহের প্রতি নীলিমা আকৃষ্ট
হইল। সে আকর্ষণের সীমা রেখা নীলিমার নিকট যতই
অস্পষ্ট হউক না কেন, কমলের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে তাহা স্পষ্টতর
হইল। ভালবাসিবার আকাঙ্খা এই সেবাপরায়ণা নারীর
মনে নিজের অগোচরে জমিয়া উঠিতেছিল। এই সংবাদে
আশুবাবু চকিত ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।

বালবিধবা বড়দিদিও জানিত না যে সুরেন্দ্রর সঙ্গে তাহার
মাধবী যত্নের সীমা কোথায় শেষ হইতে পারে। অনেকের ধারণা
(বড়দিদি) আছে যে বালবিধবাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিলে তাহার মনের
চিরন্তন নারীটিও কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। তাই তাহার উপর
সংসারের সমস্ত কর্ম্মের ভার চাপাইয়া দিয়া কর্ত্তৃপুরুষ নিশ্চিন্ত
থাকেন। কিন্তু কোন অলক্ষ্য দেবতা, কোন অসাবধান মুহূর্ত্তে,
কোন রন্ধ্র দ্বারা নারী মনে চিরন্তন মাতৃত্ব আকাঙ্খা জাগাইয়া
দেয়—তাহার সন্ধান কি কর্ত্তৃপুরুষ সব সময়ে জানেন?
সুরেন্দ্রের সঙ্গে বড়দিদি মাধবীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বিনিময় হয়
নাই; তথাপি সেবাপরায়ণা বড়দিদি সংসার-অনভিজ্ঞ ছেলেটীর

প্রতি যত্নের মধ্য দিয়া অলক্ষ্য বন্ধনে জড়াইয়া গেল। নিজের অন্তর বার্ত্তা বড়দিদিও জানিত না, সুরেন্দ্রও জানিত না। বড়দিদিও সমাজের পেষণে সুরেন্দ্রর বিষয় স্পষ্ট করিয়া বিশেষ কিছুই ভাবিতে পারিত না। সেই জন্যই মাধবী তাহাকে অনিশ্চিত অক্ষমতার দোষারোপ করিয়া অপমানের বোঝা মাথায় দিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিল। সে আক্ষেপ ত মাধবীর কখনও যায় নাই। পরিশেষে মাধবীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব বড়দিদিকে দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্র পরপারের পথে তাহার ব্যথার প্রলেপ সংগ্রহ করিয়া লইল; কিন্তু মাধবীর পরিণতি কোথায় সে সন্ধান শরৎবাবু দেন নাই।

'পল্লীসমাজে'র রমা বিধবা; রমার চরিত্র হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল। রমা নায়িকা,—'রমা+ঈশ' নায়ক। রমা ও রমেশের প্রীতি আশৈশব। তাই ত' রমা রমেশকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া নিজের উপর ভালবাসার প্রতিশোধ লইয়াছে। সে আঘাতের ব্যথা রমেশ অপেক্ষা রমাকেই বেশী আহত করিয়াছে। পারিবারিক পুরুষানুক্রমিক বিবাদ রমা ভুলে নাই। রমার বাহিরে ছিল অপরিসীম তেজ, কৌলিন্যের আভিজাত্য জ্ঞান, পুরুষোচিত দম্ভ, প্রবল জয়ের আকাঙ্খা।

অতৃপ্তবাসনা বিধবা নারীর পক্ষে শান্তরসাস্পদ প্রিয়তমকে ভুলিবার বাহ্য বস্তু ছিল—রমেশের সঙ্গে বিবাদ। বেণী ঘোষাল চিরকাল সে দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াছে—রমাকে তাহার তীব্র জ্বালায় ইন্ধন ক্ষেপণ করিয়াছে। রমেশের মহত্ত্ব, উদারতা, পরোপচিকীর্ষা রমা অপেক্ষা কে বেশী জানিত? অথচ রমেশের নিঃস্বার্থ পরোপকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করার কত না ছিল প্রয়াস—রমার মধ্যে। রমেশ যে রমার মনের সন্ধান কিছুমাত্র পায় নাই তাহা নহে, তবে রমার বাহিরের সঙ্গে অন্তরের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। সুতরাং রমা রমেশের নিকট ছিল একটী জীবন্ত সক্রিয় বিরোধ।

যে রমা রমেশকে তারকেশ্বরে নিভৃতে নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিল, নিজেকে ধন্য মনে করিল, সেই রমাই আবার কি করিয়া রমেশের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কারাগারে প্রেরণ করিল, তাহা রমেশ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ রমা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্‌কে দ্বিধাহীন ভাবে রমেশের করে সমর্পণ করিল। নারী-মনস্তত্ত্ব রমেশের জ্ঞান রাজ্যের সীমা বহির্ভূত। অথচ জেঠাই মা বিশ্বেশ্বরী নারী—তিনি এক মুহূর্ত্তে রমার মনের সন্ধান জানিলেন। রমাকে বিশ্বেশ্বরী কোন দোষারোপ করেন নাই, বরং

তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ তাহাকে সমাজের বন্ধনের ভিতর গ্রহণ করাও অসম্ভব। তাই রমাকে সমাজের বাহিরে কাশীধামে বিশ্বনাথের চরণে লইয়া গেলেন বিশ্বেশ্বরী।

'শেষ-পরিচয়ে'র সারদা, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, 'শ্রীকান্তে'র কমললতা-তিনটী বালবিধবা। জীবন সারদাকে বালবিধবা বিবাহের আশ্বাস দিয়া গৃহের বাহির করিয়াছে। ভুবন মোহন সাবিত্রীকে বিবাহের ছলনায় পুরীতে লইয়া গেল। ঊষা তথা কমললতা মন্মথর সঙ্গে কণ্ঠী বদল করিয়া তথা-কথিত বৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করিল। এই তিনটী চরিত্র বিধবা বিবাহের প্রয়োজন-সমস্যা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রত্যেকটী নারীই মাতৃত্বের আকাঙ্খায় ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিল। যদি বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে নির্ব্বিরোধে সম্ভব হইত, তবে তাহারা সকলেই বিবাহ করিয়া সুখী হইত, দশজনকে সুখী করিত। সারদার নিজের সংসার ছিলনা, রাখালের সংসারের ভার নিতে চাহিল। সাবিত্রী সতীশের সংসার গুছাইয়া দিল, পরে উপেন্দ্রর সংসারের ভার স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিল। কমললতা মুরারিপুর আশ্রমের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। গহরের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আমরা দেখিয়াছি কমললতাকে; আবার

বৃক্ষতলে রাজলক্ষ্মী লইয়াছিল শ্রীকান্তের সেবার ভার। সতীশের রুগ্ন শয্যায় সাবিত্রী ছিল সেবাপরায়ণা গৃহিনী। মৃত্যুপথ যাত্রী উপেন্দ্রর শেষ সেবার ভার সাবিত্রী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল। শরৎ সাহিত্যে নারী প্রায় সর্ব্বত্রই সেবাময়ী। শরৎ সাহিত্যের বিধবা প্রায় সর্ব্বত্রই নিঃসন্তান। রমা, বড়দিদি, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, কমল, নীলিমা, ঊষা, হেমনলিনী সকলেই সন্তানহীনা। ইহাদের মধ্যে মাতৃত্ব মুকুল পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পায় নাই। যদি তাহাদের কাহারও সন্তান থাকিত, তবে হয়ত ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহাতিরিক্ত পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নূতন গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিত না।

শরৎসাহিত্যে শিশুর স্থান খুব প্রশস্ত নয়। শিশুর প্রতি মাতার অথবা মাতৃস্থানীয়ার সুন্দর স্নেহ চিত্র আছে। কিন্তু শিশুর প্রতি পিতার স্নেহ চিত্রের শরৎসাহিত্যে খুবই অভাব। শরৎবাবু স্বয়ং নিঃসন্তান। শৈশবে মাতুল গৃহে অবাঞ্ছিত ভাগিনেয়রূপে স্বল্প পরিসর স্থানে জীবন যাপন করিয়া সত্যিকার শিশু মনের পূর্ণ আভাস পান নাই। তাই বোধ হয় শরৎবাবুর নায়কদের মধ্যে বিশেষ কাহারো সন্তান নাই। পিতৃত্বের পরে পুরুষের প্রেম ও স্নেহ ধারার বিকাশ

কি ভাবে হয়, সে দিকটাও শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত * (১০)। বঙ্কিমচন্দ্রও নিঃসন্তান, তাই বঙ্কিম সাহিত্যে শিশুমনের বিশ্লেষণ-অভাব। শিশুর মনোবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ অপরূপ শিল্পী।

শরৎ সৃষ্ট নারী প্রায় সকলেই রন্ধন-নিপুণা, সুগৃহিনী, অন্নপূর্ণা। দশজনকে পরিবেশন করিয়া, ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া নারীর আনন্দ। শরৎচন্দ্র ভোজন-বিলাসী ছিলেন। তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনীদেবীর রন্ধনে খ্যাতি ছিল। দশজনকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তিনি অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিতেন। তাই বোধ হয়, তাঁহার সমস্ত নারীর ভিতর তিনি অন্নপূর্ণারূপ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ভোজনে তুষ্ট করিয়াছে। সাবিত্রী সতীশকে পরিবেশন করিয়াছে। এমন কি খৃষ্টান কমল পর্য্যন্ত অজিতকে রন্ধনে ও পরিবেশনে তৃপ্ত করিয়াছে। চন্দ্রমুখী এবং বিজলী উভয়েই দয়িতকে আতিথেয়তায় আহ্বান করিয়াছিল।

* (১০) পুরুষের বাৎসল্য চিত্র শরৎসাহিত্যে পাওয়া যায় মাত্র 'বিরাজ বৌ' এর নীলাম্বরের মধ্যে ও 'চন্দ্রনাথে'র কৈলাস খুড়োর মধ্যে। কিন্তু নীলাম্বর অথবা কৈলাস খুড়োর স্নেহ-আধার নিজ সন্তান নহে।

গৃহ-ত্যাগিনী সধবা

শরৎ সাহিত্যে নারী মনের অন্যতম প্রশ্ন ছিল—স্বামী বর্ত্তমানে নারী কেন পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে? মাত্র দেহের প্ররোচনায় শরৎ-সৃষ্ট কম নারীই পরপুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভদ্র নারীর পুরুষান্তর গ্রহণের মূল উৎস কি?

বিবাহিত জীবনে দম্পতির মনোমালিন্য—'গৃহদাহে'র অচলা।

স্বামীর অবহেলা অথবা অত্যাচার— 'শ্রীকান্তে'র অভয়া।

প্রাক্-বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধ— 'স্বামী'র সৌদামিনী।

সাময়িক উত্তেজনা— 'শেষ পরিচয়ে'র সবিতা।

অভিমান— 'বিরাজ বৌ'এর বিরাজ।

অর্থাভাব— 'শেষ পরিচয়ে'র সারদা।

নারীর মন দুইটী। সেই জন্যই সাধারণ দৃষ্টিতে নারী দুর্ব্বোধ্য, অবোধ্য। অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"ন বিশ্বসেৎ" ইত্যাদি। নারীর একটি মন—প্রকৃতিজাত মাতৃত্ব-তৃষিত মন, অন্য একটী—সংস্কার-বর্দ্ধিত সামাজিক মন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নারীর মনোগতি বিভিন্ন প্রবাহ গ্রহণ করে। অচলা, অভয়া, সৌদামিনী, সবিতা, বিরাজ সকলেই সমাজের আপেক্ষিক দৃষ্টিতে পতিতা। অচলার মহিমের মতন অমন উদার প্রশান্ত স্বামী বর্ত্তমানে, উদ্দাম, উচ্ছাসী, অব্যবস্থিত-চিত্ত সুরেশের অনুগমন সাধারণ দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। অচলার মতন শিক্ষিতা নারী কি মহিমের অতলস্পর্শী মনের সন্ধান পায় নাই? তথাপি কেন সে চলিয়া গেল সুরেশের সঙ্গে? সবিতার অসীম শ্রদ্ধা ছিল দেবতুল্য স্বামী ব্রজবাবুর প্রতি। সবিতার স্নেহ অপরিসীম। আত্মীয় অনাত্মীয় যেই তাহার স্পর্শে আসিয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। স্থৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে সবিতা অতুলনীয়া। কিন্তু কি কারণে সে রমণী বাবুর সঙ্গে এই বিসদৃশ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল তাহার কারণ শরৎবাবু দিতে পারেন নাই। বিমলবাবুর সঙ্গে রমনীবাবুর প্রভেদ আকাশ পাতাল। রমণীবাবুর স্বার্থপরতার আবরণ যেদিন খসিয়া পড়িল, সেই সঙ্কটাপন্ন মূহূর্ত্তে আসিলেন বিমলবাবু

অচলা

সবিতা

তাহার বিরাট পরার্থপর মন লইয়া। সুতরাং বৈপরীত্য বোধে বিমলবাবুর প্রতি মানসিক আকর্ষণকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; কিন্তু রমণীবাবুর প্রতি স্থূল আকর্ষণের কারণ কি? সারদা একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল, সবিতার এই দুর্ম্মতি হইয়াছিল কেন? সবিতা উত্তরে বলিয়াছিল, "আমার এই দুর্ম্মতির জন্য গত-জীবনের কর্ম্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব আজও পাইনি।" সবিতা তাহার পদস্খলনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, সারদাকে বলিয়াছিল, যে তাহার পদস্খলন ঘটে'ছে,— 'আচম্‌কা', 'সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়' * (১১)। সবিতা স্বামী

* (১১) ঠিক সবিতার এই উক্তিকে সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ হয়, কারণ সবিতা উচ্ছাস ভরে অতর্কিতে একদিন বিমল বাবুকে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "আমার বাপের বাড়ীতে যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন তুমি এলে না কেন? তখন তুমি কোথায় ছিলে?" তবে কি পলিত কেশ বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্যবসায়ী ব্রজবাবুকে সবিতা পরিপূর্ণ মনে গ্রহণ করে নাই? বিবাহ স্বীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু ব্রজ-বাবুর স্থবির মন সবিতাকে মুগ্ধ করে নাই, জাগ্রত করে নাই! সবিতা, সৌদামিনী, পার্ব্বতী, হেমনলিনী এই চারি জনেরই স্বামী ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষ। ইহারা সকলেই বিবাহ সামাজিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু স্বামী লাভে তাহাদের নারীত্ব পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত হইতে পারিয়াছিল কি?

ব্রজবাবুর সুগৃহিনী, কন্যা রেণুর স্নেহময়ী মাতা, নন্দাই রমনীবাবুর রক্ষিতা, বিত্তশালী বিমলবাবুর বান্ধবী। সবিতার 'শেষ পরিচয়' কি ?— ব্রজবাবুর পত্নী, রেণুর মাতা, রমণীবাবুর রক্ষিতা, না বিমলবাবুর বান্ধবী ?

অভয়া স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে আসিয়াছে, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রোহিণীর সঙ্গে। তাহা কি পলায়ন ? অভয়া রোহিণীকে প্রথম প্রলুব্ধ করে নাই যেমন করিয়াছিল কিরণময়ী দিবাকরকে। কিরণময়ীর ছিল প্রতিহিংসার আবরণে অবচেতন লালসা। অভয়ার ছিল প্রধানতঃ স্বামী সন্ধান; পরিশেষে অবশ্য রোহিণীর ক্রম বর্দ্ধমান প্রেম তথা আকাঙ্খাকে অভয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই। অভয়া যখন দেখিল স্বামী মাতাল, দুশ্চরিত্র, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত, তখন বিচার করিতে আরম্ভ করিল—একদিকে তাহার বিবাহিত স্বামীর অবহেলা ও লাঞ্ছনা, অন্যদিকে রোহিণীর অবিমিশ্র প্রেম। অভয়া শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার উপর কাহার দাবী বেশী—একনিষ্ঠ রোহিণীর ? না লম্পট ভ্রষ্ট চরিত্র মন্ত্রপড়া স্বামীর ? শ্রীকান্ত স্মরণ করিল তাহার অন্নদা দিদিকে—যিনি সমাজের সমস্ত দ্বন্দ নিঃশেষ করিয়াছিলেন তাঁহার

অভয়া

ধর্ম্মবিচ্যুত মুসলমান স্বামী শাহুজীকে গ্রহণ করিয়া। অন্নদা দিদির উপর শাহুজীর অত্যাচারের অনাবৃত রূপ শ্রীকান্ত

অন্নদা দিদি

স্বচক্ষে দেখিয়াছিল; কিন্তু তবু অন্নদা দিদির আত্মবিলোপকে শ্রীকান্ত শ্রদ্ধাই করিয়াছে। শ্রীকান্ত অভয়ার যুক্তি তর্কের উত্তর দিতে পারে নাই, রাজলক্ষ্মীও স্বচ্ছন্দমনে উত্তর দিতে পারে নাই। অভয়া কি লম্পট স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায় নাই? সে জানিত তাহার স্বামী ব্রহ্ম দেশীয় পুত্র কলত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মে প্রবাস যাপন করিতেছিল। তথাপি বড় আশা করিয়া গিয়াছিল স্বামীর পার্শ্বে থাকিবে। কিন্তু পুরস্কারে বেত্রাঘাত ছাড়া অন্য কোন সহানুভূতি পাইয়াছিল কি? সামান্যা পতিতার পর্য্যায়ে কি অভয়াকে ফেলা যায়?

অচলার সঙ্গে অভয়ার প্রভেদ ঐখানে। অচলা জানিত

অচলা

মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে মহিম সুরেশের বহু উর্দ্ধে। তবু কেন সে ছুটিয়াছিল উল্কাবেগে সুরেশের পশ্চাতে? অবশ্য শরৎবাবু এমন কতকগুলি ঘটনাজাল এবং পরিস্থিতির সমাবেশ করিয়াছেন যাহা অচলার শিক্ষা এবং সংস্কারের প্রতিকূল। অচলার সংস্কার ছিল ব্রাহ্ম; শৈশবের শিক্ষার ভিতর গার্হস্থ্য আদর্শ ছিল না। কারণ মাতৃহীন কন্যার পিতৃদত্ত শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা ছিল যথেষ্ট। নারীত্বের সম্মান কোথায়, সে জ্ঞান

ছিল তাহার ব্যক্তিত্বাভিমানে ঢাকা। কাজেই মহিমকে অচলা একান্ত মনে গ্রহণ করে নাই। সুরেশকেও পরিপূর্ণ মনে বিদায় দিতে পারে নাই। ব্যক্তিত্ববাদের শিক্ষা অচলার উপর বহু পরিমাণে ক্রিয়া করিয়াছিল এক দিক দিয়া, তেমনি হিন্দুর বিবাহ সংস্কার ক্রিয়া করিয়াছিল অভয়ার অবচেতন সমাজ-প্রবুদ্ধ মনের উপর—অন্য দিক দিয়া। অবশ্য অচলার সঙ্গে সুরেশের কোন যৌন সম্বন্ধ ছিল না। হিন্দু সমাজ বিচারে সতীত্ব কি মাত্র যৌন সম্বন্ধের মধ্যে? সমাজের তুলাদণ্ডে অভয়া ও অচলা উভয়েই পতিতা। ইউরোপীয় সমাজে 'আগুণ নিয়ে খেলা চলে'। অন্নদাশঙ্করের মিঃ সোম মিস্ পেগীর সঙ্গে খেলা করিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সমাজে অচলা-সুরেশ, কিরণময়ী-দিবাকর, অভয়া-রোহিনী অথবা সবিতা-বিমলের খেলা চলে না। এদেশে কিরণময়ী, অভয়া, সবিতা, অচলা—অচল।

সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যামের সঙ্গে সবিতার স্বামী ব্রজবাবু তুলনীয়। উভয়েই পরম বৈষ্ণব; দুই জনেই ঠাকুরের চরণে সৌদামিনী সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছে। দুজনেরই স্ত্রী সুশিক্ষিতা। সবিতা ও সৌদামিনী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে। ব্রজবাবু সবিতাকে গভীর ভাবে ভালবাসিত। ঘনশ্যামের সৌদামিনী-প্রীতি অপরিমেয়।

অথচ কেহই প্রকাশ করিতে পারে না, বা চায় না। দুজনের চরিত্রেই বৈষ্ণবোচিত ঔদার্য্য ছিল। সবিতার স্বামী সবিতাকে পরপুরুষের আশ্রিত জানিয়াও প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা দানে কার্পণ্য করে নাই। ব্রজবাবু সবিতাকে ক্ষমা করিয়াছিল, কিন্তু অপরাধ ভুলিতে পারে নাই। এই দিক দিয়া সৌদামিনী ভাগ্যবতী। তাহার স্বামী সৌদামিনীর পলায়ন বার্ত্তা গোপন রাখিয়াছিল। সৌদামিনী মনের উত্তেজনায় যদিও নরেন্দ্রর সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহার ভুল বুঝিল ও স্বামীর জন্য অস্থির হইল। স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল। সৌদামিনীর ভুল তাহার স্বামীর ক্ষমা, করুণা ও আশীর্ব্বাদে মহিয়ান্ হইয়া গেল। কৃতজ্ঞতার সিক্তধারায় সৌদামিনী তাহার সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করিয়া লইল।

সবিতা সবিতার স্বামী ব্রজবাবু কিন্তু সবিতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। সবিতা নিরুপমা সুন্দরী, সুমার্জ্জিতা অতিবুদ্ধিশালিনী। সবিতার মাতৃত্ব অতি-তৃষ্ণার্ত্ত। স্বামীকে সে ভক্তি করিত, শ্রদ্ধা করিত। সবিতার ছিল না কি? স্বামী, সন্তান, গৃহ, পরিজন, সংসার, প্রতিষ্ঠা সমস্তই ত' ছিল। অথচ কোন দুষ্ট দেবতার পরামর্শে সবিতা এক মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রিয়-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নারীর আশ্রয় ভূমির অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণতম

পরিধির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল? সবিতা কি তাহার ভুল বুঝিতে পারে নাই? আত্ম-গ্লানিতে কি সবিতার মন ম্লান হইয়া যায় নাই? সবিতা যে দম্ভ লইয়া সেই গভীর রাত্রে ষড়যন্ত্রের মুখে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল সে দম্ভ কি আর তাহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল? তের বৎসর পরে সবিতা ব্রজবাবুর সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিনই বলিয়াছিল. "মেজ কর্ত্তা আমাকে তুমি ক্ষমা কর।" প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও রেণুর অসুখের সময় সবিতা পুনরায় ব্রজবাবুব গৃহে বাসের অনুমতি প্রার্থনা করিল, কারণ সেখানে তাহার 'স্বামী আছে, কন্যা আছে।' ব্রজবাবু নির্ব্বাক্। তবু পবিতাক্ত স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুমুখে বলিল—"এই ত' আমার গৃহ। এখানে আমার স্বামী আছে, কন্যা আছে, আমাকে বিদায় করে কার সাধ্য?" কিন্তু ব্রজবাবু ও সবিতার মধ্যে তের বৎসরের ব্যবধানে বাধার পাহাড় গড়িয়া উঠিয়া ছিল, 'ধর্ম্ম সংসার নীতির বাধা, সমাজ বন্ধনের অসংখ্য বিধি-বিধানের বাধা।' সবিতার পদস্খলনের কাহিনী সহৃদয় পাঠক ভুলিয়া গেল যে দিন তাহার পরিচয় পাইল বৃন্দাবনে, কন্যা রেণুর মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে শোকাতুরা মাতা-রূপে এবং রুগ্ন স্বামী ব্রজবাবুর পার্শ্বে সেবাপরায়ণা পত্নী-রূপে। সেই ত' সবিতার "**শেষ পরিচয়**"।

"শেষ পরিচয়ের" মধ্য দিয়া শরৎবাবু একটী সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কোন নারী পথ ভুলে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পুরুষান্তর গ্রহণ করে এবং পরে সত্যই অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসে, তবে কি স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে? শরৎবাবু বলিলেন, 'কেবলমাত্র অনুতাপের অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে কি করিয়া?' হিন্দু-সমাজ স্বামী-ত্যাগের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয় নাই।

বিরাজ বৌ

'বিরাজ বৌ' স্বামী ত্যাগ করিয়াছিল। দুর্ব্বল শরীর, তিন দিন অভুক্ত; গৃহ অন্নহীন, স্বামী উপবাসী; গৃহাগত স্বামীর জন্য তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। এই অপরাধে স্বামী নীলাম্বর সন্দেহ বশে বিরাজের সতীত্বের উপর 'অপবাদ দিল'। তাহাকে আঘাত করিল। বিরাজ নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। অভিমানে সতী গৃহ-ত্যাগ করিল। নীলাম্বর স্ত্রীকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত; নীলাম্বর পরে জানিল বিরাজের ভুল তাহার নিজেরই ভুল। 'নীলাম্বরের অপরাধের বোঝা মাথায় করিয়া বিরাজ ডুবিয়া গেল।' সাময়িক উত্তেজনায় বিরাজ মুহূর্ত্তের জন্য ভুল করিয়া জমিদার পুত্র রাজেন্দ্র কুমারের বজরায় উঠিল। সলিল সমাধি বরণ করিয়া সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল কিন্তু মরিতে

পারিল না। বিরাজের মতন শাস্তি কে ভোগ করিয়াছে—পরিশেষে পথে পথে ভিক্ষা বৃত্তি? অশ্রুজলে পাপস্খালনের যদি কোন ব্যবস্থা থাকে, তবে কি বিরাজের সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হয় নাই? তথাপি সমাজে বিরাজ পতিতা, দেহ মনে সে নিষ্পাপ। তবু বিরাজ নিজেই বলিয়াছিল,—"তাহার অপরাধ যতই ক্ষুদ্র হউক, একবার স্বামী গৃহ ত্যাগের পরে আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না।" যদিও বিরাজ জানিত যে মনে প্রাণে সে পূর্ণ সতী।

সমাজ ও মানব

বিরাজ বৌএর বিচার সমাজ একক ভাবে করিতে পারে না। সমাজের দৃষ্টি ব্যাপক। সুতরাং ব্যক্তিগত সুক্ষ্মবিশ্লেষণ সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ বিচারের তুলাদণ্ড—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (গ. সা. গু.)। সমাজ এবং মনুষ্যত্বের শত সহানুভূতি সত্ত্বেও বিরাজ জানিত যে হিন্দু-সমাজ সমষ্টি-বিচারে তাহাকে সমর্থন করিতে পারিবে না। সমাজের স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের স্বাস্থ্য অপেক্ষা বড়। সেইখানেই মানুষের সঙ্গে সমাজের বিবাদ। সমাজ মানব লইয়া বিচার করে, মহামানব সমাজ-গোষ্ঠীর বাহিরে। এই হইল শরৎ সাহিত্যে 'পতিতা'র ট্রেজেডী।

"স্বামী" পুস্তকের কথাও তাই। "স্বামী" নামকরণের

মধ্য দিয়া শরৎবাবু তাঁহার আখ্যান-বস্তুর মূল কথার আভাস দিয়াছেন। আত্মচরিত ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া অনুতপ্ত হিন্দু সধবা গৃহত্যাগিনী সৌদামিনীর মন বিশ্লেষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যান আরম্ভে পাঠক আভাস পাইল সৌদামিনীর কলঙ্ক। প্রাক্-বিবাহিত জীবনে মাতুল গৃহে জমিদার পুত্র নরেন্ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে তাহার অধরে কলঙ্ক রেখা। নরেন্দ্রের শিক্ষা, ঐশ্বর্য্য, যৌবন সৌদামিনীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'দোজবর, ম্যাট্রিক পাশ, আড়তদার' স্বামী প্রথম জীবনে সৌদামিনীকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঘনশ্যামের ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা ও উদারতা সৌদামিনীর হৃদয়ে স্বামীর জন্য সহানুভূতি সঞ্চার করিতেছিল। বিমাতার পরোক্ষ অত্যাচার সৌদামিনীর মনে এক পারিবারিক বিদ্রোহ ঘটাইয়া দিল। বিবাহের পাঁচ ছয় মাস পরে নরেন্দ্রকে শিকার উপলক্ষ্যে স্বামী গৃহে দেখিয়া সৌদামিনী বলিতেছে, 'তাহার মনটা এমন এক প্রকার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল যে পরকে বুঝান শক্ত'। যখন সৌদামিনীর বিবাহিত জীবনে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছিল, সেই পরিবর্ত্তন মূহূর্ত্তে শাশুড়ীর নির্লজ্জ হৃদয়হীন উক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমান-দৃপ্ত মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। অন্যদিকে স্বামীর নিশ্চল পাষাণের মতন নির্ব্বাক

সৌদামিনী

সহিষ্ণুতায় সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিল। সেই সঙ্কটময় সময়ে আসিল সৌদামিনীর মায়ের ভস্মীভূত গৃহের দুঃসংবাদ বহন করিয়া এক দুর্ভাগ্য লিপিকা। ঘনশ্যাম সে দুঃসংবাদ সৌদামিনীকে দেন নাই। সৌদামিনী দুঃখ পাইবে বলিয়াই দুঃসংবাদ গোপন করিয়াছিলেন। অথচ সৌদামিনী ঘটনাচক্রে সে পত্র পড়িল। তাহার তিক্তমনে আত্মমর্য্যাদা পুনরাহত হইল। বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশে স্বামী স্ত্রীর ভিতর নিক্তির ওজনে বাক্যালাপ হওয়া অপেক্ষা অপ্রয়োজনে অবিরাম বাক্যস্রোত চলা শ্রেয় এবং প্রেয়। তাহাতে প্রথম বিবাহিত জীবনের সহজ অভিমান-ক্লিষ্ট মনের বহু মেঘ খণ্ড ভাসিয়া যায়। 'গৃহদাহে'র মহিমও যদি অচলার সঙ্গে এক অক্ষরে আলাপ না করিত, তবে বোধ হয় বাদানু-বাদের ভিতর অনেক মেঘ কাটিয়া যাইত। সৌদামিনীর সহিত ঘনশ্যামের বাক্যালাপ এত স্বল্প ছিল যে সৌদামিনী অনায়াসে ক্ষুব্ধ মনে কল্পনার জাল রচনা করিল এবং নিজেকে জড়াইয়া ফেলিল। স্বামী কিন্তু অভিমান ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু স্ত্রীর মনের সন্ধান পাইয়াছিল। সুতরাং তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে তিনি সংকোচ মাত্র অনুভব করিলেন না। এই ঔদার্য্য ছিল 'বিরাজ বৌ' এর স্বামী নীলাম্বরেরও। সবিতার স্বামী ব্রজবাবু হয়ত

স্ত্রীর অপরাধ ভুলিতে পারিতেন, কারণ তাহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিতে শেষ পর্যান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বাধ সাধিল কন্যা রেণু। ক্ষমার রাজ্যে বৈষ্ণব ঘনশ্যামের স্থান অপ্রতিদ্বন্দী, ঘনশ্যাম আদর্শ পুরুষ। অমানুষিক ধৈর্য্য ভিন্ন স্ত্রীর প্রতি তিনি আর কোন অবিচার করেন নাই। ভাগ্যক্রমে সৌদামিনীর গৃহত্যাগের খবর সমাজ পায় নাই। সমাজের পরোক্ষে ঘনশ্যামের গৃহত্যাগিনী স্ত্রী গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে।

গৃহদাহের অচলাও সধবা স্বামীত্যাগিনী। 'গৃহদাহ' অচলা নামকরণ করার কারণ কি? মহিমের গৃহদগ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই কি 'গৃহদাহ' নাম দেওয়া হইল? কিন্তু মহিমের গৃহ-দাহেব সঙ্গে ত মূল উপাখ্যানের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। তবে কি 'গৃহদাহ' নাম রূপক? কেহ কেহ বলেন 'গৃহদাহ' রবীন্দ্রনাথেব 'ঘরে বাইরে'র প্রত্যুত্তর। ঘরের সঙ্গে বাহিরের অবাধ মিলনের ফলে গৃহে অনর্থ সম্ভাবনা। সেই মিলনে গৃহে অনর্থ হয়—যেমন হইয়াছিল সন্দীপের সঙ্গে বিমলার মিলনে; অথবা অচলার সঙ্গে সুরেশের অবাধ মিলনে মহিমের গৃহে অনর্থ। 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে'; গৃহিনীই যদি না রহিল তবে ত' গৃহ দগ্ধই হইল। চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণে ত' 'গৃহদাহ'কে 'ঘরে বাইরে'র উত্তর বলিয়া মনে হয় না। চরিত্র, আবেষ্টনী,

পরিস্থিতি, পরিণতি কিছুরই মিল নাই। বিমলা এবং অচলা সম্পূর্ণ পৃথক জগতের জীব। 'গৃহদাহে'র সঙ্গে 'ঘরে বাইরের' প্রভেদ ততটা যতটা প্রভেদ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের! যাক্, নাম বিশ্লেষণ আমাদের আলোচনার বাহিরে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসখানি মোহ, ছলনা, উদ্দামতা, কামনা, বাসনা, ভুল ভ্রান্তিরই উপাখ্যান। নায়িকা অচলা। মাতৃহীনা অচলা বালিকার শিক্ষা একদেশদর্শী। পিতা কেদার বাবু ঘোর স্বার্থান্ধ। চান্দ্র পরিবর্ত্তনের মত অতি সামান্য ঘটনায় তাহার মতের পরিবর্ত্তন হয়। পারিপার্শিক অবস্থাগুলি অর্দ্ধ পাশ্চাত্য। অচলা সংযমে অনভ্যস্থা, আত্মবিশ্লেষণ করিতে জানে না। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করিতে পারে না। অচলা অব্যবস্থিতচিত্ত অভিমানিনী। অচলা যে প্রকৃতি গত দেহ-লালসাময়ী তাহা নহে। অচলার ভিতর দুইটী বিরুদ্ধ ধারা একসঙ্গে কাজ করিতেছিল। একদিক দিয়া স্বামী মহিমের জন্য সহজ প্রীতি, অন্যদিক দিয়া সুরেশের উদ্দাম মোহময় আকর্ষণ। সুরেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে অচলা বাক্-গৃহিত স্বামী মহিমের পক্ষ লইয়া সুরেশকে যথেষ্ট আঘাত করিয়াছিল। সুরেশের মহিমের প্রতি অশ্লীল অবিচার, ইতর ইঙ্গিত এবং অযথা আঘাত সেদিন অচলাকে বিচলিত

করিয়াছিল। সুরেশের হিংস্র ব্যবহার অনুপস্থিত মহিমের প্রতি একটু মধুর সহানুভূতির সঞ্চার করিয়াছিল, অচলা মহিমকে সুরেশের আক্রমণ হইতে যথা সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। পাশ্চাত্য প্রথায় বিবাহ স্বীকৃতি-সূচক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বাক্‌-বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া লইল। অন্যদিক দিয়া পিতার বিনা সর্ত্তে ঋণ পরিশোধ, ফৈজাবাদে সহরের অগ্নিকাণ্ডে নিস্পৃহ আত্মত্যাগ, এবং সুরেশের প্রচুর অর্থ—অচলার উচ্ছাসী মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এ বিষয়ে অচলার পিতার উৎসাহ ন্যুনাধিক পরিমানে দায়ী ছিল বৈকি? সুরেশ বাক্‌দত্তা অচলাকে বিবাহের পূর্ব্বে চুম্বন করিল। 'বক্ষের উপর সজোরে টানিয়া লইল'। যে কোন সুশীলা বাক্‌দত্তা কুমারীই পরপুরুষের এই ব্যবহারে ব্যথিত অপমানিত বোধ করিয়া অপরাধীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে—ইহাই ত' ভদ্র নারীর নিকট ভদ্র সমাজে আশা করা যায়। সৌদামিনী প্রাক্‌-বিবাহিত জীবনের চুম্বনকে বিবাহোত্তর জীবনে বিষাক্ত বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে—অনুতাপ করিয়াছে। অচলার জীবনে ত' অনুরূপ কোন ইঙ্গিত নাই। বরঞ্চ পরের দিন সুরেশকে বলিল—"বাবা ত' আমাকে তোমার হাতেই দিয়াছেন।" অঙ্গুরীয় বন্ধন চুম্বন-রাগে শিথিল হইয়া গেল কি? মৃণাল বলিয়াছিল—

"স্বামী একটা সংজ্ঞা, স্বামী ধর্ম্ম, স্বামী নিত্য ; জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য।" অচলা সে শিক্ষা পায় নাই। যে দিন গ্রাম্য জীবন স্বাচ্ছন্দ-বিরুদ্ধ বোধ হইল, তৎক্ষণাৎ সে মহিমকে বলিল, "বিয়ে হ'য়েছে বলেই তোমার ঘর করতে পারবো না।" মৃণালের পল্লীগ্রামের সহজ রহস্য আলাপ অচলা সুস্থমনে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার ঈর্ষা-বিদগ্ধ মন আরও অপমানিত বোধ করিল যখন অচলা তাহার পরিবেশিত অন্ন-গ্রহণ করিতে আপত্তি করিল। স্বামী গৃহে গ্রামে অচলার এই ক্ষুব্ধ মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে সুরেশ তাহার অবৈধ অস্থিরতা লইয়া মহিমের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ অনধিকার অর্দ্ধ-অধিকারে পরিণত হইল। সুরেশ মহিমের নিকট অচলার পিতার অসুখের বিষয় মিথ্যা বলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। অচলার পক্ষ গ্রহণ করিয়া, যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, অচলার চক্ষে মহিমকে হীন করিবার চেষ্টা করিল। একদিকে মনের সঙ্কট, অকস্মাৎ আবার বাহিরে সঙ্কট—

'গৃহদাহ' হইল!

ঘরে ত' আগুণ লাগিয়াই ছিল, এবার বাহিরেও আগুণ লাগিল। মহিমের ঘর ও বাহির দুই-ই আগুণে পুড়িয়া গেল।

মহিমের ক্ষতির পরিমাণ কি দগ্ধ গৃহের ভস্মীভূত অংশ বিশেষের অচলা মূল্য দ্বারা নিরূপিত হইবে, না অচলার সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ রূপ অনর্থ দ্বারা নিরূপিত হইবে ? মহিমের রোগ শয্যায় সুরেশের গৃহে মৃণালের চরিত্র, ধৈর্য্য, সেবা, কর্ম্ম-কুশলতা, অচলার নিকট নূতন জগত আবিষ্কার করিল। অচলা উপলব্ধি করিল "স্বামীর প্রতি কায় মন নিষ্ঠাই সতীত্ব............শুধ্ দেহ বা শুধ্ মন কোনটা সম্পূর্ণ একাকী নয়।" রোগ শয্যায় অচলার নিকট মহিমের সীমাহীন মৌন আর রক্ষিত ছিল না। অচলা জীবনের এই কয়টা দিনই মহিমকে বিশেষ ভাবে কাছে পাইয়াছিল। সুরেশের স্থৈর্য্যের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই অচলা 'সুরেশকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করিল।'

মহিম ও অচলা স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে জব্বলপুরে যাত্রা করিল। হঠাৎ সুরেশ একটা দুষ্টগ্রহের মত রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সকলেই চমকিয়া উঠিল কারণ কেহই সুরেশের আবির্ভাবকে শান্ত মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অচলাকে ছলনায় মধ্য পথে সুরেশ পথভ্রষ্ট করিল; সে সাহস সুরেশকে কে দিয়াছিল ? সুরেশ অচলাকে বলিয়াছিল, "স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর ব'লেছিল, একজন পর

পুরুষকে ভালবাসো। ' যে লোক ঘরে আগুন লাগিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তারই সঙ্গে চলে আস্‌তে চেয়েছিলে এবং এলেও। ············তাই আজি আমার এই দুঃসাহস । আসলে তুমি একটী গণিকা।········ তোমাকে বার বার বলে দিচ্ছি—অচলা তুমি সতী সাবিত্রী নও।" রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথার বলিলেও অচলার প্রতি সুরেশের মনে বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না, মোহ ছিল। মনের জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, এইরূপ ধারণাই ছিল। সত্যই ত' সাধারণ দৃষ্টিতে সুরেশ অচলার সম্বন্ধে কি ধারণা করিতে পারে? অবশ্য জব্বলপুর যাত্রার অবসরে পথভ্রান্তির জন্য অচলার অতটুকু দায়িত্ব ছিল না। আর যাহা হউক, অন্ধকার রাত্রে, রুগ্ন স্বামীকে একা নির্ব্বান্ধব স্থানে ফেলিয়া অভিসারে যাওয়ার মত অতখানি নীচতা অচলার ছিল না। অচলা নিরুপায়। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে একাকিনী ভ্রমণ পটীয়সী অচলা মহিমের নিকট ছুটিয়া গিয়া সুরেশের দুর্বৃত্তির কাহিনী কি অকপটে প্রকাশ করিতে পারিত না? অচলার সে সাহস ছিল না; কারণ অতীতে যাহার সহিত চিরদিন কেবল বিরোধ করিয়াই আসিয়াছে, যাহার সহিত একাধিকবার ছলনা করিয়াছে, সে আজ তাহার কথা অকপটে

বিশ্বাস করিবে কি না অচলা নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। অচলা নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিল, তাই স্বামীর ঔদার্য্যে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

ডেহ্‌রীতে অচলা স্থরেশের অজ্ঞাতবাসের চিত্র অত্যন্ত তিক্ত। প্রতি নিয়ত 'উপদ্রুত অবমানিত লাঞ্ছিত ক্ষতবিক্ষত' মন লইয়া অবাঞ্ছিত আবাসে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রতারিত করিয়া কাটাইতে লাগিল—অচলা তাহার ক্লান্ত দিন গুলি। বাইরের যত্ন যতই বাড়িতে লাগিল স্থরেশের দিক দিয়া, হৃদয়ের তিক্ততা ততই বাড়িতে লাগিল অচলার অন্তরের দিক দিয়া। পিঞ্জরাবদ্ধ নিরুপায় হরিণীর মত অচলা স্থরেশের কামনার নখাগ্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল— অজানিত আশঙ্কায় ভবিষ্যতে কর্ম্মফল ভোগ। অন্য দিক দিয়া স্থরেশ ভাবিতে ছিল—'অচলার মতন অমন স্থন্দর জিনিষটী মাটী ক'রে দিলুম। না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।' ভাগ্যক্রমে স্থরেশ এই দুঃসময়ে মরিয়া বাঁচিল। স্থরেশের সমস্ত জীবনের উদ্দামতার সঙ্গে এই মৃত্যুর একটা সঙ্গতি ছিল, এই তাহার সান্ত্বনা। কিন্তু অচলার সান্ত্বনা কি? মহিম তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। আশ্রয়বিহীনা অচলা নিজেই বিলাতের ভ্রষ্টা বনিতাশ্রমের

অচলা

মতন একটা আশ্রয় স্থানের আভাস দিল। শরৎবাবুও অচলাকে সমাজের মধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না। মৃণালও অচলার জন্য স্পষ্ট ভাষায় কোন আশ্রয় নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই।

নীরব প্রেমিকা

নীরব প্রেমিকা সমস্যাও শরৎ সাহিত্যে আছে। তাহারা খুব বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া নাই। তাহাদের নিভৃত স্থান হইতে জোর করিয়া না বাহির করিলে তাহারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইত। বড়দিদি, নীলিমা, রমা ঘটনা ক্রমে দুর্ব্বল মূহুর্ত্তে অন্তরের অশ্রুতবার্ত্তা অতর্কিতে উচ্চারিত করিল। এমন কি ইহারা কেহই নিজের মনের কাছে নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে পারিত না। রুদ্ধশ্বাসে ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া মনকে তাহারা চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। কে জানিতে

বড়দিদি পারিত বড়দিদির নীরব প্রেমের গোপন কথা যদি মাধবীর

সম্পত্তি বিক্রীত না হইত, এবং সুরেন্দ্র আকুল হইয়া তাহাকে সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য নদীপথে না ছুটিত ? যেমন গোপনে অস্পষ্ট ভাবে মাধবী ভালবাসিত, তেমনি গোপনে হয়ত শুকাইয়া যাইত বড়দিদির ভালবাসার ক্ষীণ ধারা। নীলিমা নিজেও জানিত না যে বৃদ্ধ আশুবাবুর সেবার চোরা বালিতে তাহার পাদদ্বয় নিজের অজ্ঞাতসারে ডুবিয়া যাইতেছিল। প্রিয় কন্যা মনোরমা অজিতকে ত্যাগ করিয়া শিবনাথকে গ্রহণের ব্যথা আশু বাবুর প্রাণে খুবই বাজিয়া ছিল ; নীলিমা নীলিমা দিতে আসিল সান্ত্বনাব প্রলেপ। বিপত্নীক বৃদ্ধের সেবা পরিণত হইল সহানুভূতিতে। মনের অগোচরে সহানুভূতি পরিণত হইল গোপন প্রেমে। আশু বাবুর বিদায় বেলায় যদি নীলিমা আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিত, নিজেকে বিশ্লেষিত না দেখিত, তবে হয়ত সেই নিভৃত প্রেমের কথা আশুবাবু ও কমল কেহই জানিতে পারিত না। উৎস মুখেই সে প্রেম স্তব্ধ হইয়া যাইত।

শৈশবে একত্র বর্দ্ধিত রমেশদার প্রতি রমাব কিশোরী মন যে কবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা রমেশ সঠিক জানিত না। রমা মনের কোন্ নিভৃত কোনে কখন উপ্ত হইয়াছিল সে প্রেমের অঙ্কুর তাহা রমা কি জানিত ? কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা ব্যপদেশে

যদি রমা জেঠাইমার নিকট অসতর্ক মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ না করিত, তবে কি সেই নিভৃত প্রেমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী কখনো প্রকাশ হইত? রমেশ রমার নিকট নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভাব লাঘব করিল; রমা কিন্তু নীরব। তাহার সমস্ত পূজাই নীরবে। মাঝে মাঝে নিজের অলক্ষ্যে মনের মধ্যে নিজেকে রমেশের সঙ্গে জড়িত করিয়া ফেলিত,—তখনি চমকিয়া উঠিত, অমনি চকিতে নিজের নিকট হইতে নিজে পলাইয়া বাঁচিত। রমেশ জানিল না যে রমেশকে আঘাত করিয়া রমা নিজে কতখানি ব্যথা পাইয়াছিল। বিশেষতঃ সে আঘাত আসিয়াছিল বিশ্বাসের মূল হইতে। সুতরাং আঘাতের বেদনা উভয়েরই অত্যন্ত তীব্র। অব্যক্ত বেদনা-ম্লান রমার সে করুণ আত্মপ্রকাশ শরৎ সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

কুমারী

দেবদাস ও পার্ব্বতীর নীরব প্রেমের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন। কুমারী জীবনে সজ্ঞানে মনের প্রত্যক্ষে দেবদাসকে পার্ব্বতী ভালবাসিয়াছিল। লজ্জা সরমের বন্ধন অতিক্রম করিয়া অতিমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া উপযাচিকা হইয়া দেবদাসের নিকট নিজকে সমর্পণ করিয়াছিল। দেবদাসের দেওয়া কপালের আঘাতকে সিমন্তের সিন্দুর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দয়িতের নিকট হইতে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না পাইলে এই দুঃসাহস অবশ্য কোন হিন্দু কুমারীর আসা সম্ভব নহে। দেবদাসের ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় ও ঘটনায় পার্ব্বতী বিশেষ

সুস্পষ্ট আভাস পাইয়াছিল বলিয়াই ত' সেই সঙ্কটাপন্ন নিশীথে দেবদাসের নিকট অভিসারে গমন করিয়াছিল। দেবদাস সন্দর্শনে গমনের পূর্ব্বে পার্ব্বতীর বান্ধবী মনোরমা তাহাকে বলিয়াছিল,—"আমি মরেও যাই ত' এমন কথা মুখেও আনতে পারব' না।" এইটুকু হইল সাধারণ বাঙ্গালী সমাজে সাধারণ কুমারীর চিন্তাধারা। অথচ দ্বিধাহীন পার্ব্বতী বলিল, "মনোদিদি! তুই মিছামিছি মাথায় সিন্দুর পরিস্। কাকে স্বামী বলে, তাই জানিস্‌নে। তিনি আমার স্বামী না হ'লে লজ্জা সরমের অতীত না হ'লে, আমি অমন ক'রে মরতে বস্‌তুম না।" ভবিষ্যতে যে দেবদাস বারাঙ্গনার জন্য বহুবিধ ত্যাগ করিয়াছিল, সে কোন অদৃষ্ট বৈগুণ্যে পার্ব্বতীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল ? মনের দিক দিয়া পার্ব্বতী দেবদাসকে ভুলিতে পারিল না। বিবাহের পর স্বামী গৃহে সেবা, যত্নে, আতিথ্যে সুগৃহিনী পার্ব্বতী অতীত মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দেহ দ্বারা যথা সম্ভব অভিমানিনী পার্ব্বতী নিজের উপর প্রতিশোধ লইল—তাহাও নীরবে নিভৃতে। কিন্তু যেদিন দেবদাস তাহার অন্তিম মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীর দ্বারে পঁহুছিল, পার্ব্বতীর সকল সংযম ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার আত্মীয়-স্বজন দেখিল পার্ব্বতী পাগলিনীর মত ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার

বহুদিন সঞ্চিত স্মৃতির পসরা লইয়া দেবদাসের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে। বাহিরকে বাহির দিয়া পেষণ করা যায়—কিন্তু অন্তরকে?

'পথনির্দ্দেশে'র হেমনলিনী প্রাক্‌-বিবাহিত জীবনে গুণীন্‌কে ভালবাসিয়াছে। হেমনলিনী হিন্দু, গুণীন্‌ ব্রাহ্ম; হেমনলিনী ইহাদের পথ নির্দ্দেশ করিবে কে? হেমনলিনী ব্রাহ্ম গুণীনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আপন পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। মাতা হিন্দু সমাজের নির্দ্দেশ অনুসারে হেমনলিনীর জন্য অন্য স্বামী নির্দ্দেশ করিলেন। হেমনলিনী শিক্ষিতা; মনের শক্তি আছে, চিন্তার শক্তি আছে, আত্মপ্রকাশের শক্তি আছে। মাতার চেষ্টায় ও গুণীনের নিরপেক্ষতায় তাহার বিবাহ হইল দ্বিতীয় পক্ষ কিশোরী বাবুর সঙ্গে। বৎসরান্তে হেমনলিনী বিধবার বেশে ফিরিয়া আসিল গুণীনের গৃহে। এই বৈধব্য হেমনলিনীকে কোন বিশেষ আঘাত দিতে পারে নাই। আলোচনা ব্যপদেশে গুণীন্‌ হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার স্বামীকে কখনো ভালবাসতে কি?" হেম স্পষ্ট উত্তর দিল, "একটু ও না"। কিন্তু তবু মন্ত্রশক্তির দাবীতে কিশোরী বাবুই হেমনলিনীর বিবাহিত স্বামী। গুণীন্‌ বলিল, "যারা সতী লক্ষ্মী, তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে, বিধবা

হলে তাঁর মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তারা মরণকালে 'স্বামীর কাছে যাচ্ছি মনে করেন।" হেম প্রত্যুত্তর করিল, "আমাকে তোমরা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে, আমিও সতী লক্ষ্মী, তাই মরণ কালে 'আমি তোমার কাছে যাচ্ছি' এই কথাই মনে করব।"

প্রশ্ন হইল যে হেমনলিনীর জন্য কি কি পথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত :—

প্রথম পথ —গুণীনের সঙ্গে প্রথমেই বিবাহ হইতে পারিত।

দ্বিতীয় পথ—বৈধব্যের পরে গুণীনের সঙ্গে পুনরায় বিবাহ হইতে পারিত।

তৃতীয় পথ—মৃত স্বামীর স্মৃতি স্মরণ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিতে পারিত।

চতুর্থ পথ —গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিত।

পঞ্চম পথ —গুণীনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া পরজন্মে দয়িতের সঙ্গে মিলনের অপেক্ষা করিতে পারিত।

হেমের দুর্ভাগ্য এই কোন পন্থাই তাহার অদৃষ্টে সহিল না। গুণীনের সঙ্গে বিবাহ হইল না; মাতা মনে করিলেন

হিন্দু মতে কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু বৈধব্যের পরে মাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ হইল যে তিনিই হেমকে 'নষ্ট করিয়াছেন।' এইখানেই হেমের প্রথম ট্রেজেডী। বিবাহিত স্বামী কিশোরীবাবুকে সে ভালবাসিতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যুর পরে ফিরিয়া আসিল গুণীনের গৃহে তীব্র আশা লইয়া কারণ সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত যে গুণীন্ তাহার স্বামী। মৃত্যুপথযাত্রী মাতা কন্যাকে অনুজ্ঞা দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তার যা' ধর্ম্ম, তোরও তা' ধর্ম্ম।" কিন্তু মাতার 'পথনির্দ্দেশ' সত্ত্বেও হেম তাহার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। মন্ত্রজপের ভিতর দিয়া নিজের নিকট হইতে নিজেই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীও শ্রীকান্তকে দূরে সরাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিয়াছিল মন্ত্রজপের ভিতর দিয়া। কিন্তু পারিয়াছিল কি ? একদা হেমনলিনী গুণীনের সঙ্গে বিশ্রব্ধ আলাপের অবসরে স্বীকার করিল যে মন্ত্রজপের ভিতরে সে আর আনন্দ পায় না। অন্য একদিন হেম গুণীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা বিবাহ হওয়া কি ভাল ?" এই প্রশ্নের অন্তরালে যে আভাস ছিল তাহা গুণীন্ পাশ কাটিয়া গেল। ইচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিল না। হেমনলিনী গুণীনের জীবনে ইহা হইল অন্যতম ট্রেজেডী।

অভিমান ভরে গুণীন্‌কে ত্যাগ করিয়া দর্পিতা হেমনলিনী নিজের মৃত স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল—গুণীন্‌কে নির্ম্মম আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া। হেমনলিনী যতই শিক্ষিতা হউক না কেন, বিবাহের সংস্কার তাহার অবচেতন মনে একটা দ্বন্দ সৃষ্টি করিয়াছিল। 'সতীত্ব' শব্দ উচ্চারণ না করিলেও গুণীনের বিবাহের পরোক্ষ প্রস্তাবকে 'দুর্গতি' বলিয়া হেমনলিনী রূঢ় প্রত্যাখ্যান করিল এবং গুণীন্‌কে 'ভক্ষক' বলিয়া তিরস্কার করিল। বিবাহিত স্বামী-গৃহে হেম আপনার পথ নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু সে কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছিল না। তখনও তার পথ চলা শেষ হয় নাই। গুণীনের অসুখের সংবাদ পাইয়া হেম শেষ বার ফিরিয়া আসিল গুণীনের গৃহে। হেমনলিনীর সকল দর্প অভিমান সংযম চূর্ণ হইয়া গেল। পাঠক হেমনলিনীকে দেখিল তাহার 'শ্রাবণের আকাশভরা মেঘের মত বিপর্য্যস্ত কালো চুলে' গুণীনের দুই পা ঢাকিয়া দিয়াছে। গুণীন্ হেমনলিনীকে সান্ত্বনা দিল, "অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ।" তারপর বলিল, "চল আমরা কাশী যাই।" সেখানে প্রিয়তমের সেবা করিয়া 'সুপথে শান্তিতে' সে সারা জীবন অতিবাহিত করিবে। এই হেমনলিনীর সর্ব্বশেষ 'পথনির্দ্দেশ'। হেমনলিনী কি সত্যই পতিতা ?

হেমনলিনী, রমা, পার্ব্বতী কুমারী। এই তিনটী কুমারীই প্রাক্-বিবাহিত জীবনে ভালবাসিয়াছে—হেমনলিনী গুণীন্‌কে, রমা রমেশকে, পার্ব্বতী দেবদাসকে। হেমনলিনী ও পার্ব্বতী প্রিয়জনের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া মনের ভার লাঘব করিয়াছে। রমা তাহা করে নাই। হেমনলিনী গুণীনের মিলনের বিঘ্ন ছিল ধর্ম্ম সংস্কার, দেবদাস পার্ব্বতীর বিঘ্ন ছিল কৌলীন্য সংস্কার এবং রমা রমেশের বিঘ্ন ছিল মর্যাদা সংস্কার। হেমনলিনীর আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত স্পষ্ট। অমন সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, বিবাহের পূর্ব্বে ভিন্ন ধর্ম্মী গুণীনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে সে দ্বিধা বোধ করে নাই এবং বৈধব্যের পরে গুণীন্‌কে 'স্বামী' বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিয়াছিল। হেমনলিনীর পিতৃদত্ত শিক্ষায় সংস্কারের স্থান ছিল অতি সংকীর্ণ। অবশ্য হেমনলিনী যে সম্পূর্ণভাবে নারী-সংস্কার বিবর্জ্জিতা ছিল তাহা নহে; কারণ বিবাহের পরে কিশোরী বাবুকে স্বামী স্বীকার করিয়া তাহার গৃহে বাস করিয়াছিল এবং পরেও আর একবার ও স্বামী-গৃহে বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। নিজ মনের সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়াই গুণীন্‌কে সে 'রক্ষক' ও 'ভক্ষক' বলিয়া তিরস্কার করিতে পারিল। মনের দৃঢ়তা ও আত্মোৎসর্গ ছিল পার্ব্বতীর চরিত্রের বিশেষত্ব। পার্ব্বতী চরিত্রের

রমা
পার্ব্বতী
হেমনলিনী

অন্যতম গুণ ছিল তাহার শান্ত সমাহিত ভাব। প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতনের পর দেবদাস যখন পার্ব্বতীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল—তখন পার্ব্বতীর অভিমান তাহার কিশোরী প্রেমকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। শরৎ সাহিত্যে অভিমানের চিত্র অতুলনীয়। অভিমানই হইল পার্ব্বতীর জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজেডী। অভিমান ও সংস্কার হেমনলিনী অপেক্ষা পার্ব্বতীর জীবনকে অধিক পরিমাণে আছন্ন করিয়াছিল। পার্ব্বতী ও হেমনলিনীর সান্ত্বনা এই যে প্রিয়জনের জীবনে তাহাদের স্থান স্বল্প পরিসর হইলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন ছিল না। রমার জীবন অতীব করুণ। প্রিয়তমের নিকট সে আত্মপ্রকাশ করিতে সুযোগ পায় নাই। অথবা সুযোগ পাইয়াও আত্মপ্রকাশ করে নাই। সমাজ, সংস্কার ও কৌলীন্য-বোধ যেন রমার জীবনের ভিত্তি; অথচ সেই ভিত্তির নিম্নে অবচেতন স্তরে তাহার সমস্ত সত্বা ব্যাপিয়া ছিল রমেশের প্রতি গভীর ভালবাসা। রমার জীবন যাত্রার পরিধি ছিল অতীব সীমাবদ্ধ। প্রিয়তমের সহিত সংঘর্ষই ছিল রমার জীবনের মূল ঘটনা। রমার দুঃখের অবধি ছিল না, কারণ রমাই ছিল রমেশের কারাদণ্ডের জন্য দায়ী। পার্ব্বতীর দুঃখ এই যে তাহার মূহূর্ত্তের অভিমান ছিল দেবদাসের

অধঃপতনের কারণ। আর্টের বিচারে রমা শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। রমার চরিত্র খুব স্বাভাবিক। রমার ভিতর উগ্রতা ছিল যথেষ্ট। সেই উগ্রতার ইন্ধন ছিল বেণী ঘোষাল। বেণীই রমার জীবনের কুগ্রহ। রমেশের বিরুদ্ধে রমা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল বটে কিন্তু তার জন্য দায়ীত্ব রমার খুব বেশী নয়। কারণ ঘটনা বিপর্য্যয়ে সতীত্বের প্রতি কটাক্ষে উৎকণ্ঠিত হইয়া সুযোগ বোধে আত্মরক্ষার জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে বিবেকের কণ্ঠরোধ না করিয়া স্থৈর্য্য রক্ষা খুব কম হিন্দু নারীরই সামর্থ্য আছে। 'দেনা পাওনার' ষোড়শীর পরিস্থিতি অন্যরূপ। তাই ষোড়শী পরিত্যক্ত-স্বামী জীবানন্দের সহিত একত্রবাস-হেতু সতীত্বের উপর কটাক্ষ উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল। হেমনলিনীর ছিল হঠকারিতা। এক মুহূর্ত্তে সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইত। গুণীনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, বৈধব্যের পরে গুণীনের গৃহে আগমন, গুণীনের স্বামীত্ব স্বীকৃতি, পুনরায় ৺স্বামী গৃহে গমন, পরিশেষে গুণীনের অসুস্থতার সংবাদে প্রত্যাবর্ত্তন—পরিস্থিতি বিচারে যুক্তিসম্পন্ন। কিন্তু সমগ্র বিচারে যেন হেমনলিনী গৃহদাহের অচলার অন্য একটী দিক। মনোবিশ্লেষণে দেখা যায় অতৃপ্ত বাসনাই এই দুইটী নারীর কার্য্য কলাপের মূল-বস্তু। রমার চরিত্রে যথেষ্ট সংযম ছিল।

পার্ব্বতী ও রমা প্রায় সকল সময়ে নিজকে নিজের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিত। তারকেশ্বরে পরিবেশনের সময় রমার যথেষ্ট সুযোগ মিলিয়াছিল আত্মপ্রকাশের, কিন্তু সে নিজকে প্রকাশ করে নাই। পার্ব্বতী সখী মনোরমার নিকট আত্মবিশ্লেষণ করিয়াছিল। রমা তাহার রুগ্ন শয্যায় বিশ্বেশ্বরীর নিকট অতি সন্তর্পণে একটী বার মাত্র নিজকে প্রকাশ করিয়াছিল। সমাজ রমার অথবা পার্ব্বতীর মনের কোন সন্ধান পায় নাই। সৌদামিনীর মনেরও সন্ধান পায় নাই। শরৎবাবু রমা, পার্ব্বতী ও সৌদামিনীর চরিত্র অঙ্কনে সমাজ দৃষ্টির বাহিরে আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি তাহারা পতিতা ? * (১২) এই মানবাত্মার সঙ্গে সমাজ-দেহের চিরন্তন বিবাদের সমাধান করিবে কে ?

*(১২) রাজশেখর বাবু ('পরশুরাম') তাঁহার ভূশণ্ডীর মাঠে আনিয়া নারীর মন ও দেহের সংঘর্ষের একটী ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজশেখর বাবু ছদ্ম আবরণেও সমস্যা সমাধানের আভাস দেন নাই। এই আদিম প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' গ্রন্থখানি আমরা ইচ্ছা করিয়াই মূল আখ্যায়িকার সহিত এক সঙ্গে আলোচনা করি নাই। 'শুভদা' শরৎচন্দ্রের অপরিণত বয়সের রচনা। শরৎবাবুর এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না। এই পুস্তকে তিনটি "পতিতা" চরিত্র আছে। তাহারা শরৎসাহিত্যে 'পতিতা মনস্তত্ত্বের' বিশেষ কোন সন্ধান দেয় না। শরৎবাবু জীবনের প্রথমাংশেই পতিতা চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন; তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে গেলে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কাত্যায়নী, জয়াবতী ও ললনা—তিনটী পতিতা চরিত্র

কাত্যায়নী 'শুভদা' গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে। কাত্যায়নী গ্রাম্য নারী, চরিত্রহীনা, অশিক্ষিতা—তবু তাহার ভিতর স্ত্রীসুলভ সহৃদয়তা ছিল। সে অসময়ে হারাণ মুখুজ্যেকে দশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। শুভদার দুঃখে বিগলিত হইয়া হারাণকে সুপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

জয়াবতী সমগ্র উপন্যাসখানিতে স্বল্প পরিসর স্থান

জয়াবতী অধিকার করিয়া আছে। জমিদার সুরেন্দ্রবাবুর সহিত নৌকা বিলাস ব্যপদেশে জয়াবতীর সহিত ললনা তথা মালতীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জয়াবতী ভগ্নীস্নেহে ললনাকে গ্রহণ করিয়াছিল। পতিতার ভিতরও যে স্নেহ দরদ প্রীতি লুকাইয়া থাকিতে পারে, শরৎচন্দ্র তাহা যৌবনের প্রথম পাদেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টি লইয়াই তিনি জয়াবতীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

ললনা – ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা, দারিদ্রক্লিষ্টা। পারিপার্শ্বিক

ললনা অবস্থা নারকীয়—পিতা দুশ্চরিত্র, ভ্রাতা মুমূর্ষু, মাতা উপবাসী, পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই অন্ধকার।

ললনা চোখের উপর সবই দেখিতেছে, বুঝিতেছে, কিন্তু কিছুই করিবার উপায় নাই। নিজের অনভিজ্ঞ মস্তিষ্ক ও বিচার বুদ্ধি দ্বারা যত দূর সম্ভব সে অর্থসমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিল। বাল্য সখা সারদাচরণকে ডাকিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। বিধবার এই আত্মসমর্পণের ভিতর যত না ছিল দেহের আবেদন, তদধিক ছিল দুঃস্থ পরিবারের আথিক অস্বচ্ছলতার প্রতিকার। পরিবারের দুঃখ দূরীকরণ মানসে অনভিজ্ঞা বালিকা কলিকাতার পথে যাত্রা করিল—নিজের সুন্দর দেহ বিনিময়ে সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। সুতরাং দেহের আবেদনে ললনা গৃহত্যাগ করে নাই। সুরেন্দ্রের উদারতা ও সহৃদয়তা ললনাকে অভিভূত করিয়াছিল; সে তাহার নিকট আপনাকে সমর্পণ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সুরেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই তাহার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ললনা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। শরৎবাবু কোথায়ও বিধবার বিবাহ দেন নাই। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ললনাকে পিতৃগৃহে ফিরাইয়া আনিতেও সাহস পান নাই। শরৎবাবু ললনার কোন স্পষ্ট রূপ অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। সাহিত্য দৃষ্টি রেখা তখনও

স্পষ্ট করিয়া শরৎচন্দ্রের মনে অঙ্কিত হয় নাই। 'শুভদা' গ্রন্থে পরিস্থিতি সৃষ্টি সহজ হয় নাই। ভাষার জোরও তেমন নাই। চরিত্রাঙ্কনও সুরুচি পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু নারীর প্রতি দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম সাহিত্য দৃষ্টির ভঙ্গিমার সহিত ভবিষ্যতের দৃষ্টির সঙ্গতি আছে। কথোপকথন মাঝে মাঝে মনোরম। এই গ্রন্থ দ্বারা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিচার করা সমীচীন নহে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা—	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৫৫,৬৮	অঙ্গনে	অঙ্গণে
৪,৫,৭,৯,	অদ্ভুত	অদ্ভূত
১৩	অর্থান্তকল্যে	অর্থান্তকুলে
৯৫	অনভ্যস্তা	অনভ্যস্থা
১৫,২৫	অনুভূতি	অনুভুতি
৪৯	অন্তর্দৃষ্টি	অন্তর্ দৃষ্টি
৯৪	অপ্রতিদ্বন্দ্বী	অপ্রতিদ্বন্দী
৫৪	অসন্দিগ্ধ	অসংদিগ্ধ
৭২	অসম্পূর্ণ	অসম্পুর্ণ
৩৭	অস্পষ্ট	অস্পষ্ঠ
৭৬,৭৯,৮৫	আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্খা
২৭	আলোচনার	আলোচনা
৩৭	আগুন	আগুণ
১১২	আচ্ছন্ন	আছন্ন
৭১	আয়ত্ত	আয়ত্ব
৪৬	ইঙ্গিতে	ঈঙ্গিত
৮৩,৮৪	উচ্ছ্বাসী	উচ্ছাসী
৬৭	উদ্ধত	উদ্ধৃত
১	কৌতূহল	কৌতুহল
১৬	কল্যাণকর	কল্যানকর
৫৭	কিরণময়ী	কিরণমী
১০	কোণে	কোনে
১২	কৈশোর	কিশোর
১০৭,১০৮,১০৯,১১০,১১১	গুণীদের	গুণীনের
১০	গার্হস্থ্য	গার্হস্থ
১৫	গোষ্ঠী	গোষ্টী
৪১,৯৪	গৃহিণী	গৃহিনী
৩১,৩২,৬৭,৯৫	গৃহীত	গৃহিত
৪৩,৭২,	চতুষ্পার্শ্বে	চতুস্পার্শ্বে
৫	চিহ্ন	চিহ্ণ
৯	জাহ্নবী	জাহ্ণবী
২৩	তামকূট	তামকুট
১১৩	দায়িত্ব	দায়ীত্ব
১৪	দুষ্কার্য্য	দুস্কার্য্য
৯৯	দুর্বৃত্তির	দুবৃত্তির
৩৫,৮৬	দ্বন্দ্ব	দ্বন্দ
২১	নির্ব্বাণ	নির্ব্বান
১	নকুড়	নকুর
৯৬,১১৩	ন্যূনাধিক	ন্যুনাধিক
১৪,৪২,৫৯,৬০,৬৪	নূতন	নুতন
১১১	নিশ্চিহ্ন	নিশ্চিহ্ণ
৯	নিষ্কম্প	নিস্কম্প
৪৬	পারবেনা	পারবে না
৩৯	পরিস্ফুট	পরিস্ফূট
৬৩	পাত্রাপাত্র	পাত্রাপত্র
৯৫	পারিপার্শ্বিক	পারিপার্শিক
১৬	পুষ্ট কলেবর	পুষ্ঠ কলেবর
১১	প্রতীক	প্রতিক

পৃষ্ঠা—	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৬৭	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ্য
১৬	প্রতি সপ্তাহে	প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে
১৫	বহিষ্কৃত	বহিস্কৃত
৩৬	প্রেমাস্পদ	প্রেমাষ্পদ
৬৩	বাণী	বানী
৭	ব্যূহ	ব্যুহ
১৭	ফণীন্দ্র	ফনীন্দ্র
২০	ভ্রাম্যমাণ	ভ্রাম্যমান
৫৬	ভস্ম	ভষ্ম
১৩,৮৮,৯২,১০০	মুহূর্ত্ত	মুহুর্ত্ত
৬৪	মূলে	মুলে
৮৮	মহীয়ান্	মহিয়ান্
৫৬	মনস্তত্ত্বের	মনস্তত্বের
১৪	মাতামহ	মাতিমহ
৮৩,৮৫	রমণীবাবু	রমনীবাবু
৬৪	রাখার	রাখায়
২৬	রোহিণী	রোহিনী
১২	শ্মশানে	শশ্মানে
১২	শ্রেষ্ঠাংশে	শ্রেষ্টাংশে

পৃষ্ঠা—	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৪৫	সহানুভূতি	সহানুভুতি
৪০	সম্পূর্ণ ভাবে	সম্পূর্ণ ভা
১০৫	সীমন্তের	সিমন্তের
১০৬	সিন্দুর	সিন্দূর
১১১	সংকীর্ণ	সংঙ্কীর্ণ
৬৪	স্বকীয়	স্বকীয
৭০,১১৩	স্বামিত্ব	স্বামীত্ব
১৭	স্বরূপ	স্বরূপে
৪৪	সত্তা	সত্ত্বা
৬৪,৫৮	সত্ত্বেও	সত্বেও
৯১	সূক্ষ্ম	সুক্ষ্ম
৬৪	সুমহৎ	সুমহান্
২৬	স্পষ্ট	স্পষ্ঠ
৫১	Lady'sman রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা।	Lady'sman রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা।
৩৭	পরিচিত না করিত,	পরিচিত না করিত;